ইচ্ছামতী

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃবসন্ত সংখ্যা ২০০৯.....1

বসন্তের কথা: খলসী ফুলের গন্ধ.....3

গল্প-স্বল্প.....10

এক্সট্রা.....10

পুষুর দুঃস্বপ্ন.....18

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ২.....22

পড়ে পাওয়া: পিঁপড়ের লড়াই.....25

গত সংখ্যায় পেয়েছি: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়.....26

মনের মানুষ: গন্ডালু গল্পকার.....28

দেশে-বিদেশে.....30

টোকিও না টাকি- কোথায় থাকি?.....30

টিয়াপাখিদের দেশে.....36

ছবির খবর: ছোটদের তপন সিংহ.....42

বায়োস্কোপের বারোকথা: আলোর জাদুকর.....44

পরশমণি: কেটলির গুঞ্জন.....46

জানা-অজানা: অমর একুশে.....48

কমিক্স্ কাহিনী: গাবলু আসলে হেনরি.....52

এক্কা-দোক্কা: হারিয়ে যাওয়া খেলা.....54

আঁকিবুকি.....56

প্রথম পাতাঃবসন্ত সংখ্যা ২০০৯

কিছুদিন আগে মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে হয়ে গেল সরস্বতী পুজো। হলুদ শাড়ি বা সাদা পাঞ্জাবি পরে সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিয়েছিলে তো? আর দুপুরে কি খেলে? খিচুড়ি আর পাঁপড়ভাজা? পুজোর আগে আবার ভুল করে কুল খেয়ে ফেলনি তো? পুজোর পরের দিন দই-খই এর ফলার খেয়ে দেবী সরস্বতী তো তাঁর রাজহাঁস কে নিয়ে চলে গেলেন নিজের মায়ের কাছে। আর এখানে? আশীর্বাদের সাথেই তোমার আর তোমার মায়ের জন্য রেখে গেলেন বার্ষিক পরীক্ষা!! আরো অন্য বন্ধু- দাদা-দিদিদেরও শুরু হয়ে গেছে, বা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে নানা রকমের পরীক্ষা। ভাল লাগে কারো? - কিন্তু কি আর করবে বল? পরীক্ষার পড়া তো করতেই হবে। বরং পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে, ইচ্ছামতীর সাথে ভাব করে ফেল। দেখবে, মন ভাল হয়ে যাবে।

সরস্বতী পুজো চলে যাওয়া মানেই কিন্তু শীতের ছুটি। শীতবুড়ো যে নিজের লেপ-কম্বল পিঠে ফেলে চলে গেছে, সেটা তো একটু একটু করে বাড়তে থাকা গরম, দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া আর ক্রমশঃ বড় হওয়া দিন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সামনেই আবার আসছে দোলপূর্ণিমা। উত্তর ভারতের 'হোলি' আর বাঙ্গালিদের 'দোল' - একই উতসবের দুই নাম। ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় এই উতসব বয়ে নিয়ে আসে নতুন জীবনের বার্তা। শীতঘুমের রেশ কাটিয়ে চারিদিকে বড় বড় গাছের ন্যাড়া ডালে জেগে উঠেছে কচি সবুজ পাতা। শহরের মাঝে ফ্লাইওভার দিয়ে যেতে যেতে হঠাত দেখা হয়ে যায় দশতলা বাড়ির পাশে লাল টকটকে পলাশ ফুলে ভরা একলা গাছটার সঙ্গে। একা একাই জানিয়ে দিচ্ছে - বসন্ত এসে গেছে। তোমার বাড়ির কাছে কি কোন পার্ক আছে? বা গাছপালায় ভরা বাগান? যদি থাকে, চলে যাও একদিন বিকেলবেলা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও। দেখবে কত রকমের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসবে - আমের মুকুল, শিরীষ, মধুমালতি, কৃষ্ণচূড়া, করবী -রঙ আরে সুগন্ধে দিকবিদিক ভরিয়ে তুলে জানান দেবে- এসে গেছে ঋতুরাজ বসন্ত।

দেখতে দেখতে ইচ্ছামতীও তৃতীয় সংখ্যায় পা দিল। 'বসন্ত সংখ্যা ২০০৯' এসে গেল তোমার জন্য নিয়ে অনেক গল্প আর জানা অজানা নানা তথ্য। এই সংখ্যায় 'দেশে-বিদেশে' বিভাগে আমরা বেড়াতে যাব জাপানের টোকিও, পশ্চিমবঙ্গের টাকি আর ফ্লোরিডার প্যারট জাঙ্গল-এ। অন্যান্য ধারাবাহিক এবং নিয়মিত বিভাগ গুলি ছাড়াও থাকছে নতুন একটি বিভাগ - তোমার এবং আমার প্রিয় কমিকস চরিত্রগুলির খবরাখবর নিয়ে 'কমিকস কাহিনী'। আরও আছে। এই দখিনা হাওয়ার দিনগুলি কেমন কাটে পাখিরালার আনন্দীর আর আন্দুবস্তির সুরেশের? - জানতে হলে পড়ে ফেল এই 'বসন্তের কথা'। গত সংখ্যায় চেয়েছিলাম 'রঙ' নিয়ে গল্প। কিন্তু আমাদের কোন পাঠক-পাঠিকাই এই বিষয় নিয়ে গল্প/লেখা পাঠায়নি। তাই এই সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক কোন গল্প রইল না।

ইচ্ছামতী যে শুধু ছোটদের কথাই বলছে না, বড়দেরকেও ফিরিয়ে দিচ্ছে ছোটবেলার স্বাদ, আমাদের

'চিঠি পাঠাও' বিভাগ দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। ইচ্ছামতীকে সবার ভাল লাগছে জেনে আমিও খুব খুশি। একটা ছোট্ট তথ্য তোমার সাথে ভাগ করে নিচ্ছি। গত দুটি সংখ্যার ইচ্ছামতী পড়ে ফেলেছেন পৃথিবীর ছাব্বিশটি দেশের প্রায় ছয়শোর ও বেশি পাঠক-পাঠিকা! আমাদের ছোট্ট ইচ্ছামতী এত মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে জেনে তোমারও নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে? ছোট -বড় সব পাঠকের ভাললাগা আর ভালবাসা নিয়ে এগিয়ে যাবে ইচ্ছামতী- এই তো চাই। তোমার এবং তোমার বন্ধুদের আরো আরো লেখা আর ছবি চাই কিন্তু ইচ্ছামতীকে সাজিয়ে তোলার জন্য।

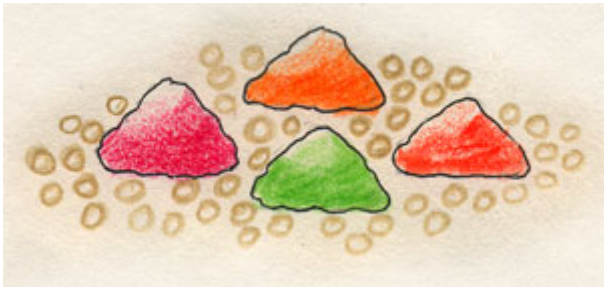

এইবার থামি। তোমার জন্য সাত-রঙা আবির আর আঁচল ভরা পলাশ-শিমূল-শিরিষ রেখে এবারের মত শেষ করলাম প্রথম পাতা।

চাঁদের বুড়ি

বসন্তের কথা: খলসী ফুলের গন্ধ

আজ সকালে ঘুম ভাঙলো কোকিলের কুহু কুহু ডাকে। বুঝতে পারলাম বসন্ত এসে গেছে। সকালের শির-শিরানি ঠান্ডা বাতাসটা কোথায় যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল। হাড় কাঁপানো শীতের বুড়ি আমার দেশ ছাড়তেই কোথা থেকে একঝাঁক মিষ্টি তাজা আনন্দের হাওয়া আমার বাড়ির চারপাশে, গঙ্গার ঘাটে, রক্তকরবীর ডালে, নিমগাছের কচি পাতায় আর পাশের বাড়ির সিরাজুলের পরীক্ষার টেবিলে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

দখিণা হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে নদীর জল

আমার জানলার ধারে লাইট পোষ্টের তারের ওপর দুটো কাক বেশ কিছুদিন ধরে বাসা বাঁধছিলো। এবার দেখলাম তারা ডিম পেড়েছে আর মনের আনন্দে বসে বসে তা দিচ্ছে। পাঁচটা ডিম,অবশ্য তার মধ্যে কটা কোকিলের সেটা আমি জানি না। বেশি বলতেও চাইনা। ফস করে কাক গুলো যদি শুনে ফেলে।

কটা কোকিলের ডিম কে জানে!

স্নেহার অবশ্য এদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে শুধু জানে অনেক দিন বন্ধ থাকার পর এবার তাদের সুইমিং ক্লাস আবার শুরু হবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সাঁতার কাটতে তার বেশ ভালো লাগে।

কিন্তু পাখিরালা গ্রামের আনন্দির বেশ মন খারাপ। নৌকার ওপর চুপ করে বসে আছে।

আনন্দী

জিজ্ঞেস করলাম, "কি আনন্দি কোথায় যাবে?" সে মাথা নেড়ে জানালো কোথাও না। গতিক সুবিধের ঠেকলো না। যে আনন্দির বকবকের ঠেলায় গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেই আনন্দি চুপ কেন? কেউ কি বকেছে? এবারেও সে মাথা নেড়ে জানালো "না"। তাহলে? চেপেচুপে ধরতে সে আমাকে যে

গল্পটা শোনালো তাতে মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। প্রতি বছরের মতো এবারেও তার বাবাকে যেতে হবে মধু আনতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে।

মধুর খোঁজে যাত্রা শুরু

কাল রাতেও তো বাঘের ডাক শুনেছে আনন্দি। জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ,আরো কত বিপদ আছে জঙ্গলে সেসব জানে আনন্দি। বাবার মধু আনতে যাওয়া মানে মায়ের মুখভার,ঠাকুমার কান্নাকাটি। আর বাবা যতদিন না বাড়ি ফিরে আসছে ততদিন তার মা সূর্য ওঠার আগে রান্না করবে। সেই রান্না তারা সারাদিন ধরে খাবে। চুলে তেল দেবে না। মাছ-মাংস ছোঁবে না। আর সবসময় মনে মনে জঙ্গলের দেবী মা বনবিবি আর বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়কে স্মরণ করবে। বারবার প্রার্থনা করে বলবে তার বাবা আর গ্রামের সবাই যেন ভালোভাবে ফিরে আসতে পারে।

বনবিবি আর দক্ষিণ রায়

এই সময় সুন্দরবনের জঙ্গল আলো করে ফুটে থাকে হরেক রকমের ফুল। তার মধ্যে খলসী ফুলকেই সবচেয়েভালো লাগে আনন্দীর।

খলসী ফুল- যা দেয় সোনারঙা মধু

এই ফুলের মধুর রঙ যেন গলানো সোনা। আর খেতে? এই মনখারাপের সময়েও যেন জিভে জল এলো আনন্দির। চটপট উঠে পড়লো বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হবে। কারণ বিকেলে সে বাবার সাথে হাটে যাবে পুজোর বাজার করতে।

আন্দুবস্তির সুরেশ রাভা দাওয়ায় বসে ঢুলছে। সামনে খোলা কিশলয় বই। আমি গিয়ে সুরেশের মাথায় হাত দিলাম। সুরেশের ঘুমের চটক ভাঙলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্কুলে গিয়েছিলে?" সুরেশ ঘাড় নেড়ে জানালো "হ্যাঁ"। এই সুরেশকে গতকাল সারা রাত ভুট্টার ক্ষেত পাহাড়া দিতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে এখোনো বেশ শীত। রাতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়ে। সুরেশের ক্ষেত একেবারে জঙ্গলের গায়ে।

ভুট্টার ক্ষেতে যাচ্ছে কি?

আর সেটাই বিপত্তি ও ভয়ের কারণ। পালে পালে হাতি এই সময় গ্রামে ঢুকে পড়ে ভুট্টা খাওয়ার লোভে। তাদেরকে ভয় দেখিয়ে আবার জঙ্গলে পাঠাতে হয়। সেই কাজটা খুব একটা সুবিধের নয়। ক্ষেতের লাগোয়া জায়গায় বাঁশ দিয়ে উঁচু করে একটা ছাওনি করা হয়। যাকে বলা হয় মাঁচা। সেখান থেকে ক্ষেতের ওপর নজর রাখতে হয়। হাতি এলে মুখে আওয়াজ করে, আগুন জ্বালিয়ে, টর্চের আলো গায়ে ফেলে, টিন পিটিয়ে তাদের তাড়াতে হয়। নাহলে এতদিন ধরে যে ভুট্টার গাছ গুলোকে বড় করতে সুরেশরা পরিশ্রম করেছে তা সবই হাতির পেটে যাবে। তখন সুরেশরা খাবে কি?

আন্দু বস্তির ছেলেমেয়েরা

তাই সুরেশ সারাদিন স্কুল আর কাজের পর রাত জাগে গোটা গ্রামের সাথে। এখন এটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। সামনেই আসছে রক্তক পুজো। তার প্রস্তুতি চলছে গ্রামে। সেদিকেই গেল সুরেশ।

ঠিক এরকমই এক বসন্তের সকালে পরিচয় হয়েছিলো অন্ধ গায়ক, তেরো বছরের বেচয়ানের সাথে। বিহারের সমস্তিপুরের নাম শুনেছো কি? সেই সমস্তিপুরের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল মাইসট। সেই মাইসটের এক অনেক দূরের গ্রাম ঝারোলাটোলা।

বেচয়ানের গ্রাম

এই গ্রামেই বেচয়ান থাকে। গোটা গ্রামকে সে গান শোনায়। আর সবাই খুশি হয়ে যা দেয় তাই দিয়ে তার মা সংসার চালান। এই গ্রামের সবাই খুব গরীব। এতো গরীব গ্রাম আমি এর আগে দেখিনি। গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষ কাজের সূত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকেন। আর হোলির সময় গ্রামে ফেরার চেষ্টা করেন। খুব মজা আর আনন্দে কাটে কয়েকদিন।

হোলির দিনে সবাই মিলে আনন্দ

গ্রামের ছেলেদের মধ্যে বেচয়ান এখনো পর্যন্ত বাইরে কাজ করতে যায় নি। তার বন্ধুরা সবাই চলে গেছে কেউ কলকাতায়, কেউ দিল্লী, কেউ মুম্বাই। তাদের সবার কাছে গল্প শুনে বেচয়ান ঠিক করলো সেও এবার কিছু একটা কাজ করবে। বন্ধুদের মতো রোজগার করবে। বোনের বিয়ে দেবে। ছট পুজোয় মাকে দেবে নতুন শাড়ি। গ্রামে তার ইজ্জত বেড়ে যাবে। বেচয়ান যখন আমাকে তার এই স্বপ্নের কথা বলছিলো তখন আমি মজা করে তার গল্প শুনছিলাম। আর ভুলেও গিয়েছিলাম। কাজের সূত্রে সেবার কয়েকদিন বেচয়ানদের গ্রামে থাকতেও হয়েছিলো। একদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙলো কান্নাকাটির শব্দে। গ্রামের রাস্তায় একটা ছোটখাটো মিছিল। সেই মিছিলের আগে বেচয়ান। হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে গড়গড় করে হাঁটছে। আর তার পিছন পিছন বেচয়ানের মা, বোন কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। আর তার পেছনে গ্রামের আরো বউ,বাচ্চা। আমি গিয়ে মিছিলটাকে থামাই।

বেচয়ানকে জিজ্ঞেস করি,"এত সকালে কোথায় চললে বেচয়ান?" বেচয়ান হাসি মুখে বললো,"বড়া শহর"। আমি বললাম "সেকি তুমি তো কোনোদিন গ্রামের বাইরেই যাওনি।" মহিলারা আরো হু হু করে কেঁদে উঠলো। এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন,"বাবু মাইসটের ছেলেদের এতো কমজোরী ভাববেন না। ওরা সব পারে।" আমার শুধু অবাক হওয়ার পালা। কখোনো ভাবতে পারিনি যে বিহারের সেই ছোট্ট গ্রামের একরত্তি ছেলে মুখে যা বলে কাজেও সেটা করে দেখানোর সাহস রাখে। এই বেচয়ান সত্যি একদিন অনেক টাকা নিয়ে ফিরে আসবে। তার বোনকে বিয়ে দেবে। মাকে কিনে দেবে ছট পুজোয় শাড়ি। আর কখোনো কোনো বড় শহরের রাস্তায় যদি তোমার সাথে বেচয়ানের দেখা হয়ে যায় তাহলে

সে তোমাকে শোনাবে তার গ্রামের কথা, সূর্যমুখী ক্ষেতের কথা। আর মন ভালো থাকলে হয়তো গাইবে কমলা নদীর সেই গানটা যেটা সে গুনগুন করে সব সময় গাইতো।

বেচয়ানের গ্রামের সূর্যমুখীর ক্ষেত -বাসন্তী রোদে ঝলমল করছে

লেখা ও ছবি -
কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

গল্প-স্বল্প

এক্সট্রা

স্কুলের সামনের মাঠে জোর ফুটবল খেলা চলছে দু'দলের – তুবড়ি ভার্সেস রকেট। সাইড লাইনের পাশে গালে হাত দিয়ে চুপটি করে বসে আছে রাজু। খুব মন খারাপ তার। তাকে কেউ খেলতে নেয় না। একমাত্র যদি কেউ চোট পেয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে আসে তখন ওর ডাক পড়তে পারে। কিম্বা হঠাৎ যদি বল মাঠের বাইরে অনেক দূরে চলে যায় তো বড় দাদারা বলতে পারে – 'যা এক্সট্রা, বলটা কুড়িয়ে নিয়ে আয়।' তখন একটু বলটা ছোঁয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়া আজকের মত রোজ রোজ সারা টিফিন টাইম বলের দিকে তাকিয়ে চাতক পাখির মত বসে থাকা। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে যায় এক একদিন।

হঠাৎ একটা বল জোরে শট মারল ক্লাস এইটের মানস। লাফাতে লাফাতে বলটা ঢুকে গেল পশ্চিমের বাগানে। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল – 'এক্সট্রা, বলটা নিয়ে আয়।'

'সমীর কে বলো।'

'তুই যাবি কি যাবি না। না গেলে কিন্তু আর খেলতে পাবি না।'

ইচ্ছে ছিল না একটুও। কিন্তু খেলতে পাওয়ার লোভে হাঁটা দিল রাজু। মাঠের পশ্চিম দিকের এই বাগানটা রায়দের। বেশ বড়সড় একটা জঙ্গল যেন। সেই বাগানের মাঝখানে রায়দের একটা অনেক পুরনো পোড়ো বাড়ি আছে। কেউ কত কাল সেখানে বাস করেনা কে জানে। বাড়িটার দিকে তাকালেও কেমন একটা গা ছম ছমে ভয় করে রাজুর। আজও বুক ঢিপ ঢিপ করছে। তাও এগোচ্ছে সে।

বাগানের ভারী লোহার গেটটা খুলতে বাঁ হাত ঠেকালো। কিন্তু বেশী জোর দেওয়ার আগেই একটা বিশ্রী ক্যাঁ-চ আওয়াজ করে গেটটা খুলে গেল। মাথা নিচু করে ঢুকে যায় রাজু। কোনভাবেই বাড়িটার দিকে চোখ পড়ে যায় ও চায় না। ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় যেখানে বলটা পড়েছিল। কিচ্ছু চোখে পড়ে না। আতিপাতি করে খুঁজতে থাকে। মাঠ থেকে উঁচু ক্লাসের দাদাদের নির্দেশ আসে – 'ঐ

যে কয়েত বেলের গাছটার তলায় দ্যাখ। '

রাজু দেখল। কিচ্ছু নেই। কয়েত বেল, সবেদা গাছ, আম গাছ সব মিলিয়ে বন হয়ে আছে। নীচটায় বিস্তর ঘন ঝোপ। সেখানে অনেক বিছুটি গাছ। গায়ে লেগে গেলেই এমন কুটকুট করবে। সাবধানে এগোয় রাজু। এপাশে বড় গাছগুলোর গায়ে ইয়া বিশাল বিশাল মাকড়সার ফাঁদ আর তাতে বড় বড় লোমশ মাকড়সা ফাঁদ পেতে রয়েছে। কে জানে এদের মধ্যে কেউ টারান্টুলার বংশধর কিনা। যদি একটা কামড়ায় তাহলে স্পাইডার ম্যান হয়ে যেতে পারে ও। তখন আর কোন কিছু ভয় পাবে না রাজু। নানা রকম ভাবতে ভাবতে ও এগোতে থাকে। হঠাৎ পা পিছলে যায়।

গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যেতে থাকে। কি জানি কতক্ষণ একটা অন্ধকার সুরঙ্গ বেয়ে ও পড়ছিল। ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল। ওর রোগা পটকা শরীরটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চোখের চশমাটা বুঝি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তারপর এক সময় ধপাস করে পড়ল কোথাও। চোখ খুলে দেখে একটা সবুজ আলো চারিদিকে। কিছুতেই রাজু বুঝতে পারছে না এ কোথায় এসে পড়ল। কোথা থেকেই বা সবুজ আলোটা আসছে। তারপরে খেয়াল হল রাজুর বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের পাশে যে এক্সট্রা আঙ্গুলটা আছে সেই আঙ্গুলের নখটা থেকে সবুজ আলো ঠিকরে বেরচ্ছে। রাজু এত অবাক হল যে ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এই আঙ্গুলটার ওপর ওর এতদিন ভীষন রাগ ছিল – একে তো আঙ্গুলটা কোন কাজের নয় তার ওপরে ক্লাসে এটার জন্যে সবাই ওকে আলাদা করে রাখে। স্কুলের ছোট বড় সবাই ঐ এক্সট্রা আঙ্গুলের জন্যে ওকে 'এক্সট্রা' বলে ডাকে। একদিন এত দুঃখ হয়েছিল যে মাকে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলেছিল যে ডাক্তার কাকুকে বলে আঙ্গুলটা কেটে বাদ দিয়ে দিতে। মা বলল, 'ভগবান যখন এটা দিয়েছে তোকে তখন নিশ্চয় কোন একটা ভালো উদ্দেশ্য আছে। বড় হলে একদিন ঠিক বুঝতে পারবি'। এখন মনে মনে রাজু ধন্যবাদ দেয় মাকে। ভাগ্যিস এটা মা বাদ দিতে দেয়নি। তাই এই অন্ধকারে একটু আলো দেখা যাচ্ছে। না হলে বুঝতেই পারত না কোন দিকে যাবে।

হাল্কা সবুজ আলোর মধ্যে দেখল একটা দরজা। ভয়ে ভয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তক্ষুনি দরজাটা ম্যাজিকের মত খুলে গেল। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখে একটা অন্য পৃথিবী। জ্যোৎস্নার মত নরম আলো চারিদিকে। সেই আলোতে সব কিছু পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে সে। একটুও ভয় করছে না ওর। ও ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখলো। যতদূর চোখে পড়ে মনে হল কেমন উঁচু নিচু পাহাড়ি জায়গা। চারিদিকে অনেক সরু সরু বাঁশ গাছের জঙ্গল। মাঝে মাঝে জলা জায়গা। কিছু বড় বড় আকাশ ছোঁয়া লম্বা মোটা মোটা গাছ। সেই রকম একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যের এক কোটর থেকে একটা অন্য রকম আওয়াজ পেয়ে উঁকি মারে রাজু। দেখে কিছু অদ্ভুত দর্শন ছোট ছোট সাইজের প্রানী। তিনটে বাচ্চা মা-এর গা ঘেঁসে ঘুমাচ্ছে আর মা প্রানীটা কি সব আওয়াজ করছে। ওকে দেখেই মা প্রানীটা উঠে বসল। ডাক দিল ওর বন্ধুদের–'দ্যাখো এসে গেছে আমাদের বন্ধু। তোমরা যে যে দেখা করতে চাও চলে এসো তাড়াতাড়ি।'

মুহূর্তের মধ্যে বাঁশ বন আর জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শয়ে শয়ে সেই অদ্ভুত দর্শন প্রানী। বিড়ালের থেকে একটু বড় আকারের। প্রায় সবার গায়ের রঙ লালচে কমলা ঘেঁষা। পা গুলো কালো। মুখে, চোখে, কানে সাদা ছোপ ছোপ। কেউ কেউ তাদের পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে খানিকক্ষন। মোটা লোমশ লেজ। ডগায় গোল গোল দাগ। সবাই এসে ওকে ঘিরে ধরল। বলল,

'সুস্বাগাতম বন্ধু। আমাদের দেশ তোমার কেমন লাগছে?'

'বেশ ভালো লাগছে।'

ওদের কথার উত্তর দিয়ে রাজু নিজেই চমকে গেল খুব। ও কী করে এই সব প্রানীদের ভাষা বুঝতে পারছে? আর কথাও বলতে পারছে? রাজু জিজ্ঞাসা করে – 'তোমরা কি আমাকে চেন? তোমরা কে? আমি কখনো তোমাদের মত প্রানী দেখিনি।'

তখন একজন খুব বয়স্ক প্রানী ঐ ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো। ওকে বলল সামনের উঁচু জায়গাটায় উঠে যেতে। রাজু উঠে গিয়ে একটা ঢিপিতে বসে। বয়স্ক প্রানীটাও উঠে গিয়ে পাশে বসে। বলতে শুরু করে –

'আমরা লাল পান্ডার বংশধর। এই পান্ডা রাজ্যে আমি রাজা। এদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমার। কিন্তু সম্প্রতি আমরা একটা বিপদে পড়েছি। তুমি আমাদের সাহায্য করলে আমরা সেই বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারি।'

'আমি? আমি কি করে তোমাদের সাহায্য করব?'

'তুমি কি খেয়াল করেছ যে তোমার হাতেও ছটা আঙ্গুল আছে আমাদের মত। যে সব মানুষের হাতে আমাদের মত ছটা আঙ্গুল থাকে তাদের বিশেষ ক্ষমতা থাকে। তারা আমাদের দেশে এলে আমাদের ভাষা বুঝতে পারে। তারা আমাদের দেশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওই ছ'নম্বর আঙ্গুলের নখ থেকে সবুজ আলো বেরোয়। আর আমাদেরও ছ'নম্বর আঙ্গুলের নখ থেকে সবুজ আলো বেরোয়। তাতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের এক বন্ধু এসেছে এই দেশে।'

রাজু খেয়াল করল সত্যি ওদের সবার হাতে ছটা আঙ্গুল। আর সেই এক্সট্রা আঙ্গুলের নখ দিয়ে ওর মতই হাল্কা সবুজ আলো বেরচ্ছে।

ও বলল, 'আমি তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারলে খুব খুশী হব। বল কি রকম সাহায্য চাও তোমরা।'

'বলব সব। আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব খিদে পেয়েছে।'
সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল রাজুর। ওরা অনেক ফল আর নরম নরম হাল্কা সবুজ ছোট কাঠির মত কিছু এনে দিল। ও অবাক হয়ে ভাবল এগুলো কি খাওয়া যাবে। তাও মুখে পুরল একটা। আহা কী সুন্দর নরম মিষ্টি খেতে সবুজ কাঠি গুলো। ফল গুলোও খুব সুস্বাদু। সব খাবার এক নিমেষে শেষ করে ফেলল। তার পর উঠে গিয়ে ঝর্নার জল খেল।

তখন পান্ডা রাজা বলল চলো দেখবে চলো। ওকে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল ওদের দেশ। মা পান্ডারা কেমন কাঠি আর পাতা দিয়ে গাছের কোটরে বাসা বেঁধেছে। ছোট পাণ্ডা গুলোর গায়ে তেমন লোম নেই। কিছু ছোট পান্ডার গলায় আর লেজে কেমন ঘা মতো হয়েছে।

তাই দেখে রাজু বলল -'পান্ডা রাজা, ওদের গায়ে ঘা কেন?'

'বন্ধু, ওটাই ওদের অসুখ। বেশ কিছু বছর ধরে ছোট ছোট পান্ডার এই অসুখ হচ্ছে। আর কয়েক

সপ্তাহের মধ্যে ওরা মরে যাচ্ছে। তাই পান্ডাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই ভাবে চললে আর কয়েক বছর পরে লাল পান্ডা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি যদি কোনভাবে এর ওষুধ এনে দিতে পারো তাহলে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।'

'আমি চেষ্টা করব। কিন্তু কি করে বুঝবো যে কোন ওষুধে তোমাদের এই অসুখটা সত্যিই সারবে?' পান্ডা রাজা খানিকক্ষন ভাবল। তারপর একটা খুব ছোট্ট বাচ্চা পান্ডাকে ডাকল। বলল – 'এর নাম ভিন্ডি। এর মা বাবা কেউ নেই। সবাই এই অসুখে মারা গেছে। এরও গায়ে ঘা হয়েছে। একে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। কোন ওষুধের সন্ধান পেলে সেটা আগে এর গায়ে লাগিয়ে দেখবে। যদি এর ঘা সেরে যায় তাহলে বুঝতে পারবে তুমি ঠিক ওষুধ খুঁজে পেয়েছ। তখন বেশী করে ঐ ওষুধ নিয়ে ভিন্ডিকে সঙ্গে করে এখানে এস। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।'

সঙ্গে সঙ্গে খুশী মনে ভিন্ডি লাফিয়ে ওর গায়ে উঠে ওর ঢোলা প্যান্টের পকেটে ঢুকে পড়ল।
'কিন্তু এখানে আবার আসব কি করে?'

'কেন? যে ভাবে এসেছ সে ভাবেই। বাগানের গেটের লোহার দরজাটায় তোমার এক্সট্রা আঙ্গুলটা ঠেকাবে আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যাবে। তারপরে সবেদা গাছের নীচে আসবে। বিছুটি গাছ বাঁচিয়ে ডান দিকে হেঁটে আসবে। যেখানে অনেক লাল লাল ছোট ছোট ফলের গাছ আছে। তার ফুল গুলো দেখবে উলটানো কলসির মত। ওখানে এসে দাঁড়ালেই তুমি এখানে এসে পৌঁছে যাবে।'
'আচ্ছা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব পান্ডা রাজা।'

পান্ডা রাজা তখন ওকে পাহাড়ের এক গুহাতে নিয়ে গেল। সেখান একটা বিশাল গর্ত দেখিয়ে বলল – 'এই গর্ত দিয়ে গড়িয়ে যাও। যেখানে ছিলে সেখানে পৌঁছে যাবে।'

রাজু সবাই কে বিদায় জানিয়ে সেই গর্তে ঢুকে পড়ল। এইবার আর ওর ভয় করল না। নখ থেকে বেরনো আলোতে ও সুরঙ্গটা বেশ ভাল দেখতে পাচ্ছিল। একটুও তালগোল পাকালো না শরীরটা। বেশ স্লিপে চড়ার মত করে নেমে এল আস্তে আস্তে।

বেরিয়েই দেখে সবেদা গাছটা আর তার নীচে সেই লাল ফলের গাছটা। তার ফুল গুলো সত্যি উলটানো কলসির মত। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের টিফিন শেষ হওয়ার ঘন্টা বাজল ঢং ঢং করে। এক ছুটে রাজু ঢুকে গেল স্কুলে। ক্লাসে সারাক্ষণ খুব সাবধানে নড়াচড়া করল। সিট থেকে একবারো উঠলো না। কেউ যদি দেখে ফেলে পকেটের ভিন্ডিকে। পাশে বসে অরিত্র ফিসফিস করে জিগ্যেস করল – 'তুই বাগানে ঢুকে কোথায় ভ্যানিস করে গেলি? শেষে মিহিরদা গিয়ে বলটা কুড়িয়ে আনল।'

'আমি ওই দিকে কটা পাকা সবেদা পড়েছিল সেগুলো কুড়োতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সবগুলো পাখিতে খাওয়া বিচ্ছিরি।'

২

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় স্কুল বাস থেকে নেমে বাড়ি না ঢুকে সোজা বাড়ির কাছের একটা পার্কে

গেল রাজু। সেখানে গিয়ে একটা বড় ঝাউ গাছের আড়ালে বসল। টিফিনটা খাওয়ার সময় হয়নি আজ। মা দেখলে বকবে। টিফিনটা ভিন্ডির সঙ্গে ভাগাভাগি করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে। তাছাড়া ভিন্ডির সঙ্গে অনেক আলোচনাও আছে। কী ভাবে ওষুধ খুঁজবে তার কোন আইডিয়া আসছে না মাথায়।

পকেটে হাত দিয়ে ভিন্ডিকে বার করতে যায় রাজু। দেখে কিচ্ছু নেই। পকেট ফাঁকা। কোথায় গেল। পকেটেই তো ছিল। মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় রাজুর। তখন ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কুঁই কুঁই শব্দ পায়। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খোলে। দ্যাখে ব্যাগের ভেতরে ভিন্ডির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

'আরে ভিন্ডি। তোকে না দেখতে পেয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'স্কুলে অনেক ছেলে দেখে ভয় পেয়ে তোমার ব্যাগে ঢুকে পড়েছিলাম।'

ভিন্ডি ওর গা ঘেঁষে বসে। দুজনে মিলে ভাগ করে টিফিন খায় আর গল্প করে।

টিফিন খাওয়া শেষ হলে রাজু ভিন্ডিকে জিজ্ঞেস করে - 'কী করে জানা যায় বলতো কী ওষুধে তুই ভালো হবি?'

ভিন্ডি বলে - 'দেখি ঐ হুলো বিড়ালটা কিছু জানে কিনা। চলো ওকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।'

দুজনে যায় হুলো বিড়ালের কাছে। 'বিড়াল ভাই, বিড়াল ভাই, তোমার একটু সাহায্য খুব দরকার।'

হুলো বিড়ালটা পেট ভরে খেয়ে সবে একটা হাসনুহানার ঝোপের মধ্যে একটু ঘুমাচ্ছিল। রেগে গিয়ে বলে –

'বিরক্ত কোরো না এখন। দেখছ না ঘুমাচ্ছি।'

'তুমি না সাহায্য করলে আমি বাঁচব না। দেখো আমায় গা। কেমন সব লোম উঠে যাচ্ছে। তুমি এর ওষুধ জানো?' ভিন্ডি নিজের গা দেখায়। হুলো বেড়াল তখন সামনের ডান পা দিয়ে চোখ রগড়ে উঠে বসল। বলল –

'আমি কী আর জানি? তবে ঐ কাঠবিড়ালীটা জানতে পারে। চলো ওর কাছে যাই তিনজনে।'

পার্কের এক কোনে এক ঝাঁকড়া কাঠবাদাম গাছের নীচে কাঠবিড়ালীটা তখন ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজছিল। ওরা কাছে গিয়ে বলল – 'কাঠবিড়ালী, একটু দাঁড়াও ভাই। আমাদের কিছু কথা বলার আছে।'

'আমি খাবার জোগাড় করায় খুব ব্যাস্ত আছি। দেখতে পাচ্ছ না?'

'আমরা তোমায় বাদাম কুড়িয়ে দিই যদি?'

'না না সে তোমরা পারবে না। আচ্ছা বলো কি দরকার।'

সব শুনে কাঠবিড়ালী বলে – 'আমি এসবের খবর রাখিনা। চলো দেখি ঐ কাঠঠোকরাটা জানে কিনা।' কাঠঠোকরাটা একমনে গাছের গুঁড়িতে ঠক ঠক করে গর্ত করে পোকা ধরে খাচ্ছিল। সে বিরক্ত না

হয়ে সব মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল – 'কাকেরা খুব বুদ্ধিমান হয়। কাকগুলো জানলেও জানতে পারে। চলো সবাই মিলে ওদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।'

সবাই মিলে যায় কাকেদের কাছে। এক ঝাঁক কাক বট গাছের মাথায় বসে গল্প গুজব করছিল। তারা সব শুনে ভয়ানক জোরে কা কা করে সবাই কে জানিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে – 'কেউ কি জানো এর ওষুধ?'

এক কাক বলে – 'একজন জানতে পারে। হুতুম প্যাঁচা। খুব জ্ঞানী আর অনেক বয়স তার। পার্কের পেছন দিকে একটা অর্জুন গাছ আছে। তার কোঠরে সে থাকে। ওর কাছে যাও।'

সবাই মিলে গেল প্যাঁচার কাছে। প্যাঁচা শুনলো খুব গম্ভীর হয়ে। তারপরে বলল – 'জটিল সমস্যা। আমি পাখিদের অসুখের ওষুধ জানি। কিন্তু জন্তু জানোয়ারদের অসুখের সম্বন্ধে খুব বেশি জানিনা। তবে একটা গোপন খবর দিতে পারি। প্রত্যেক অমাবস্যার রাত্রে এই পার্কে জন্তু জানোয়ারদের সভা হয়। তারা তাদের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। অনেক জ্ঞানী গুনী জন্তু জানোয়াররা আসে। তোমরা সেই সময় এসে কথা বলে দেখতে পার।'

'এ তো দারুন ব্যাপার। ঠিক আছে তাই আসব। এমন সুযোগ হারানো যাবে না।'

'তবে সভা শুরু হয় অনেক রাত্রে। সভায় সভাপতি থাকে এক শেয়াল। সে তিনবার হুক্কা হুয়া বলে ডাকে। তারপরে শুরু হয় আলোচনা। তোমরা এই আওয়াজটা শুনতে পেলেই পার্কে চলে আসবে। ঘুমিয়ে পড়ো না যেন।'

রাজু আর ভিন্ডি প্যাঁচা, কাঠঠোকরা, কাঠবিড়ালী, হুলোবিড়াল আর সব কাকেদের কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ি এসে দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দেখল ভালো করে। আর মাত্র দুদিন পরেই অমাবস্যা। ঠিক করল প্যাঁচার কথা মতো ওরা সেই দিন পার্কে যাবে।

৩

অমবস্যার দিন রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাজু আর ভিন্ডি দুজনে জেগে বসে রইল বিছানায়। ঘরের একটা জানলা খুলে রাখল যাতে শিয়ালের ডাক শুনতে পায়। এপাশে রাত বাড়তে থাকে। ঘুমে চোখ বুজে আসছে রাজুর। মাঝেমাঝেই ঘুমিয়ে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছে ভিন্ডির গায়ে। ভিন্ডির চোখে ঘুম নেই। বসে বসে চীনা বাদামের খোলা কড়মড় করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাদাম খাচ্ছে সে। রাজু উপায় না দেখে ভিন্ডির মতো চীনাবাদাম খেতে শুরু করল। হঠাৎ হুক্কাহুয়া ডাকে চমকে গেল রাজু। তারপর গুনে গুনে ঠিক তিনবার হুক্কা হুয়া ডাক দিয়ে থেমে গেল শেয়ালটা। তখন চুপিচুপি দুজনে বেরল বাড়ি থেকে। রাজুর হাতে একটা টর্চ। রাস্তা খুব অন্ধকার। দেখল রাস্তায় কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, খরগোস, হনুমান, কাঠবিড়ালী আরো কত রকমের প্রানী। সবাই চলেছে পার্কের দিকে। অন্যদিন হলে রাজু এত রাত্রে বাড়ির বাইরে বেরোনার কথা ভাবতেই পারত না। কিন্তু আজ সব কিছু অন্যরকম।

পার্কের কাছে পৌঁছতেই দেখল দুটো ভয়ংকর দেখতে বিশাল চেহারার কুকুর গেটে পাহারা দিচ্ছে। তারা প্রথমে রাজুকে ঢুকতে কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছিল না। তারপর ভিন্ডি ওদের অনেক করে বোঝালো যে

রাজু ওর বন্ধু। রাজু সাহায্য করেছে বলেই আজ ও এখানে আসতে পেরেছে। তখন কুকুর দুটো নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলে নিল। তারপর বলল –'একমাত্র একটা শর্তে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি। ভেতরে গিয়ে একটা কথাও বলা চলবে না রাজুর।'

সেই শর্ত মেনে নিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকলো। দেখল সভা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ভেতরের বড় ফুটবল খেলার জায়গাটায় গোল হয়ে সবাই বসে আছে। আশে পাশের গাছের কোন ডালও খালি নেই। কয়েক শো প্রানী। রাজু সবার নাম ও জানে না। কারো কারো ছবি দেখেছে শুধু। একজন মোটাসোটা বয়স্ক শেয়াল মাঝখানে বসে কিছু বলছে। রাজু আর ভিন্ডি গিয়ে সামনের দিকে বসল। সবাই ওদের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে।

ভিন্ডি বলল – 'চিন্তা করোনা। ওরা এই সভায় কোন দিন কোন মানুষকে আসতে দেখেনি। তাই খুব অবাক হয়েছে।'

শেয়ালটা নিজের বক্তব্য শেষ করেই ভিন্ডিকে ডাকল। ভিন্ডি গিয়ে সব কথা বলল। শিয়ালটা আরো কয়েকটা শেয়ালের সঙ্গে আলোচনা করে নিল। তারপর বলল - 'নিম।'
ভিন্ডি বলল – 'নিম?'

শিয়ালটা বলল – 'নিম গাছ খুব উপকারী। নিমের গাছের পাতা, ফল, ফুল, ছাল থেকে অনেক রকম ওষুধ তৈরী হয়। তোমরা কি জানো আফ্রিকাতে নিম গাছকে বলে মারোবাইনি। যার মানে এমন গাছ যা চল্লিশটা অসুখ সারাতে পারে। যাও গায়ে নিম পাতার রস গায়ে লাগাও। আর রোজ দু চারটে করে নিম পাতা চিবিয়ে খাও। সব অসুখ সেরে যাবে।'

রাজু শুনে খুব খুশী হল। এত সোজা ওষুধ। নিম গাছ তো অনেক আছে। পার্কের মধ্যেই আছে বেশ কয়েকটা। শেয়ালকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে এল ওরা।

পরদিন সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পুকুরের ধারের নিম গাছ থেকে এক মুঠো কচি পাতা তুলে আনে রাজু। দু হাতের চেটোর মাঝে নিম পাতা রেখে থেঁতলে রস বার করে লাগিয়ে দেয় ভিন্ডির গায়ে। দুটো পাতা ওর মুখে দিয়ে বলে – 'নে, চিবিয়ে খেয়ে নে।'

ভিন্ডি নিম পাতা চিবিয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে - 'ইস কী বিচ্ছিরি তেতো খেতে।'

'কিন্তু খুব উপকারী। এটাই তোর ওষুধ। লাফাস না। খেয়ে ফেল।'
এই ওষুধ চলল রোজ। তিনদিনের দিন পুরো সেরে গেল ভিন্ডির অসুখ। তাই দেখে রাজু আর ভিন্ডির খুশির সীমা রইল না।

পরদিন সকালে স্কুল যাওয়ার সময় রাজু একটা বড় প্যাকেট ভর্তি নিম পাতা আর একটা বড় প্যাকেট ভর্তি নিমের ফল ঢুকিয়ে নিল ব্যাগে। ভিন্ডিকে পুরে নিল প্যান্টের পকেটে। তারপর স্কুলের টিফিনের সময় সবাই যখন খেলায় ব্যাস্ত, তখন চুপি চুপি ঢুকলো রায় বাগানে। গেটে ওর এক্সট্রা আঙ্গুলটা ঠেকাতেই খুলে গেল দরজা। তারপর এসে দাঁড়ালো সবেদা গাছের তলায় সেই লাল ফলের গাছটার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে হুস করে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে। সবুজ আলো বেরতে থাকল ওর আর ভিন্ডির নখ থেকে।

ওকে আর ভিন্ডিকে দেখে পান্ডা রাজা আর তার দেশের সবাই খুব খুশী হল। ভিন্ডির অসুখ সেরে গেছে দেখে ওদের চোখ গুলো আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠলো। ও নিম পাতার প্যাকেটটা দিল পান্ডা রাজা কে। আর জলা জায়গার চারপাশে ছড়িয়ে দিল সব নিম গাছের ফল। বলে দিলো – 'এই ফলগুলো থেকে গাছ জন্মাবে। গাছ একটু বড় হলে পাতা তুলে পাতার রস লাগাবে গায়ে। আর রোজ দুটো একটা পাতা তুলে খাবে। যখন ফল ধরবে এই গাছে পাকা ফল ঝরে ঝরে পড়বে, তখন সেই ফল নিয়ে গিয়ে ফেলে দিও সব জলা জায়গার আশে পাশে। এইভাবে একদিন এই গাছ পান্ডা রাজ্যের চারিদিকে ছেয়ে যাবে। তোমাদের কোন দিন আর পাতার অভাব হবে না। আর অসুখও হবে না।' সবাই খুব খুশি হল। ওকে অনেক ধন্যবাদ জানালো। বলল মাঝে মাঝে ঘুরে যেতে পান্ডা রাজ্যে।

কাজ সেরে রাজু ফিরে এলো স্কুলে। খুব মন কেমন করতে লাগল ভিন্ডির জন্যে। কদিনে বেশ বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে মন খারাপ করে বসে রইল রাজু। আর ঠিক তখনই পকেট থেকে ভিন্ডি বেরিয়ে টেবিলে উঠে বলে – 'তোমার মনখারাপ কেন?'

'আরে, তুই কোথা থেকে এলি?'

'আমি তো পালিয়ে এসেছি এখানে তোমার সঙ্গে থাকব বলে।'

'কিন্তু পান্ডা রাজা জানতে পারলে খুব দুঃখ পাবে। রেগেও যাবে হয়তো।'

'আমি পান্ডা রাজাকে বলেই এসেছি। এখন চলো দুজনে পার্কে গিয়ে একটু খেলে আসি। আর কাঠবিড়ালী, প্যাঁচা, কাঠঠোকরা, হুলো বিড়ালদের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

রাজু আর ভিন্ডি দুই বন্ধুতে দারুন সময় কাটে এখন। ভিন্ডি বাঁশ তেমন খেতে পায় না। কিন্তু নানা রকম ফল, বাদাম, মুরগীর ডিম আর পোকামাকড় খেয়ে দিব্যি খুশীতে আছে। দিনের বেলা রাজু স্কুলে গেলে ভিন্ডি অনেক ঘুমায় আর বিকেলে রাজু স্কুল থেকে ফিরলে সারাক্ষন রাজুর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। রাত্রেও জেগে থাকে অনেক্ষন। এখনো রাত জাগা অভ্যেসটা যায়নি। সময় পেলে ওরা মাঝে মাঝেই ঘুরে আসে পান্ডা রাজ্যে। তখন পেট ভরে বাঁশ খেয়ে আসে ভিন্ডি। রাজুকে এখন কেউ এক্সট্রা বলে ডাকলে আর দুঃখ হয়না ওর। ওরা তো কেউ জানেনা ওর লুকোন ক্ষমতাটা।

রুচিরা
বেইজিং, চীন

পুষুর দুঃস্বপ্ন

আলমারির তাকে থরে থরে সাজানো মধুভর্তি বয়ামগুলোর দিকে তাকিয়ে পুষুর দু চোখ চকচকিয়ে উঠলো। 'কি মজা, দশ-দশটা বয়ামভর্তি মধু' - নিজের অজান্তেই হাততালি দিয়ে উঠল পুষু।

বাঘা ছিল পাশেই। বললো-'হুম, খুব মজা। কিন্তু দেখিস, লালহাতিয়াটা এসে আবার রাত্তিরে সব সাবাড় না করে ফেলে।'

'সেই ভয়ংকর লালহাতিয়াটা?' - পুষু চোখ বড় বড় করে ফেললো।

'ব্যাটা এক নম্বরের লোভী' - বাঘা বললো। 'তুমি কি দেখেছো ওকে?' 'না',বাঘা বললো,'কিন্তু দেখিনি বলেই কি আর ভয়টা কমে যায় না কি? দেখতে পাচ্ছি না বলেই তো আরও সাবধান হতে হবে। ব্যাটা কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে?'

পুষু বললো,'আমি সাবধানেই থাকবো, তুমি চিন্তা কোরো না।'

'হুমমমমম', গরগর করলো বাঘা,' তাহলে এখন আমি চলি'।

পুষু দরজা বন্ধ করে খাটে এসে উঠলো। মস্ত বড় ফাঁকা বাড়িটায় একলা পুষু জেগে রইলো। নাক পর্যন্ত লেপ চাপা দিয়ে মিটিমিটি চেয়ে দেখতে লাগলো লালহাতিয়াটা ঢুকে পড়ে কিনা। চেয়ে থাকতে থাকতে, চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমে চোখ বুজে এলো পুষুর।

এমন সময়, হটাত, সারা বাড়িটা উঠলো কেঁপে, যেন ছাতের উপর বাজ পড়েছে। হুড়মুড় করে দরজা ভেঙ্গে একটা মস্ত লালহাতিয়া দুমদাম করে ঘরে ঢুকে পড়লো। থালা বাসন ঝনঝনিয়ে, পেয়ালা-পিরিচ ভেঙ্গে, বাতিদানটা উলটিয়ে ফেলে থপথপ করে সেটা এগিয়ে গেলো মধুভর্তি আলমারির দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গবগবিয়ে সাবড়ে দিলো তিনটে বয়ামভর্তি মধু।

পুষু ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললো।

কান্নার আওয়াজে লালহাতিয়াটা ঘুরে দাঁড়ালো পুষুর দিকে।ক্যাটকেটে সবুজ রঙের ঘোলা চোখ দিয়ে

কটমট করে চাইলো। সুরুত করে নীল শুঁড় বার করে পুষুর সর্বাঙ্গ শুঁকলো। 'আহা, এবার তো তোকে খাবো'। বলেই একটা খালি বয়াম পুষুর মাথায় উলটে দিলো।

ভয়ের চোটে খাট থেকে লাফ মেরে নীচে নামলো পুষু। দুহাত দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলতে চাইলো বয়ামটা - কিন্তু বয়ামটাতো আর নেই মাথায়?! আর লালহাতিয়াটা? সেটাই বা কোথায় গেলো?

'কোথায় লুকোলো ভয়ংকরটা?' পুষুর মনে একরাশ দুশ্চিন্তা। ভয়ে খুঁজতেও পারছে না সে কোনোখানে। ভয়টাকে কোনোরকমে চাপা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো কচিকাঁচার বাড়ির দিকে।

'ভাইরে, বাঁচা আমাকে' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো পুষু, কোনোরকমে। 'কি হয়েছে-এত রাতে?' ঘুমের ঘোরে দুচোখ রগড়াতে রগড়াতে শুধোলো কচিকাঁচা। 'একটা সা-সাং-ঘাতিক ল-লালহাতিয়া!' জিভ টিভ জড়িয়ে একশা পুষু তখন।

ঘুম ছুটে গেলো কচিকাঁচার। তার আর তখন ভাবার সময় কোথায়? একছুট্টে পুষুর হাত ধরে বেরিয়ে এলো সে ওই অত রাতে। ভালো করে ভেবে দেখার সময় পেলে কি আর সে একটা সাংঘাতিক লালহাতিয়ার খোঁজে এভাবে বেরিয়ে আসতো?

বাড়ির সামনে এসে হাঁক পাড়লো পুষু-'কোথায় লুকিয়েছিস রে লালহাতিয়া? বেরিয়ে আয়।'

কচিকাঁচা পুষুর দরজার কোনা থেকে ঝাঁটাটা নিয়ে বনবন করে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলো।

'আচ্ছা পুষু', কচিকাঁচার যেন হঠাত ঘুম ভাঙ্গলো, 'যদি সত্যিই আমরা লালহাতিয়াটাকে দেখতে পাই, তাহলে কি করবো?'

তাইতো? তাইতো? তাইতো? ভেবে কুলকিনারা পেল না পুষু। 'তারচেয়ে চল, কেষ্টদাকে ডেকে আনি', কচিকাঁচা বললো।

'সেই ভালো'- হাঁপ ছাড়লো পুষু।

কেষ্টদা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দুজনে মিলে ঠেলে তুললো অকে। 'পুষু', একটু যেন বিরক্ত গলায় বললো কেষ্টদা, 'তুই নিশ্চয়ই একটা যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখেছিস। সত্যি সত্যি কোনো লালহাতিয়া নেই।' 'কি বলছো তুমি?' অভিমানী গলায় পুষু বললো,' ওই লালহাতিয়াটা আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ওড় নীল শুঁড়টা দিয়ে আমাকে শুঁকছিলো। বললো আমাকে খেয়ে ফেলবে। আর তুমি বলছো সত্যি নয়?'

'ঠিক আছে', কেষ্টদা একটু নরম গলায় বললো,'তোর বাড়িতে যদি সত্যি সত্যি একটা লালহাতিয়া লুকিয়ে থাকে, তাহলে আমি আর কচিকাঁচা মিলে ওটাকে খুঁজে বার করবই।'

'আমরা? দুজনে মিলে?' ঢোঁক গিলে বললো কচিকাঁচা।

'হ্যাঁ রে ভীতুর ডিম', ধমকে বললো কেষ্টদা। 'বেশ, তাই হবে', কচিকাঁচা বললো।

সবাই মিলে লেফট-রাইট করতে করতে চললো পুষুর বাড়ির দিকে। তাড়াতেই হবে লালহাতিয়াটাকে।

বিছানার তলায় খুঁজলো। লালহাতিয়া নেই।

আয়নার পেছনে খুঁজলো। লালহাতিয়া নেই।

টেবিলক্লথ তুলে টেবিলের নীচে খুঁজলো। লালহাতিয়া নেই।

আলমারির দরজাটা খুললো। কী আশ্চর্য! দশটা বয়ামই তো থাকে থাকে সাজানো, ঠিক যেভাবে ঘুমোতে যাবার আগে সাজিয়ে রেখেছিলো পুষু।

কান চুলকোতে লাগলো পুষু। 'তাইতো, তবে ত স্বপ্নই দেখেছি। কিন্তু স্বপ্নটা বড্ড সত্যির মতো। কেন এরকম স্বপ্ন দেখলাম বলোতো?'

'স্বপ্নগুলো মাঝে মাঝে সত্যি মনে হয়', বিজ্ঞের মত বললো কেষ্টদা। 'কিন্তু সেগুলো সব মনের মধ্যে দেখা দেয়, সত্যি সত্যি নয়।'

'কিন্তু', পুষু বললো,' আমি যদি ঘুমিয়েই ছিলাম, তাহলে মনের মধ্যে লালহাতিয়াটা ঢুকে পড়লো কি করে?'

'শোন পুষু', কেষ্টদা মাস্টারমশাইয়ের মতো গলায় বললো,' রোজ রাতে তুই যখন ঘুমোতে যাস, তখন তোর শরীরটাই শুধু ঘুমোয়, মগজটার অনেকখানি জেগে থাকে।'

'আর সেই জেগে থাকা মগজটাই তখন স্বপ্ন দ্যাখে, বুঝলি?' ফুট কাটলো কচিকাঁচা।

'ঠিক তাই। এমনিতে স্বপ্নরা খুব সুন্দর হয়, আর না হলে বোকা বোকা। জেগে উঠে আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু তুই যদি খুব ক্লান্ত হয়ে বা চিন্তা করতে করতে ঘুমোতে যাস, তাহলে সেই বোকা বোকা স্বপ্নগুলোই বিদ্ঘুটে আর ভয়ংকর হয়ে যায়।' কেষ্টদা ভাষণ শেষ করলো।

'আসলে আমি একটু বেশিই চিন্তা করছিলাম শুতে যাওয়ার সময়ে। আর ঘুমটাও যা জোর পেয়েছে - কিন্তু-' পুষু ভাবতে ভাবতে বললো।

কচিকাঁচা জোর করে পুষুকে বিছানায় গুঁজে দিলো।

'আচ্ছা, আবার যদি আমার মগজ ঘুমের মধ্যে লালহাতিয়াটাকে ফিরিয়ে আনে?'পুষু জিজ্ঞেস করলো।

'দ্যাখ', কেষ্টদা বললো,' স্বপ্নটা তো তোর নিজের। তুই-ই ঠিক করবি তুই কি করতে চাস। যদি লালহাতিয়াটা ফিরে আসে, সোজা ওর চোখে চোখ রেখে বলবি -এইও-খবরদার - এক্ষুণি এখান থেকে চলে যা।'

'লালহাতিয়া-পালা-লালহাতিয়া-পালা-লাল-' বিড়বিড় করতে করতে পুষু আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

কচিকাঁচাকে সঙ্গে নিয়ে কেষ্টদা নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

এমন সময়ে, হঠাত, আবার সারা বাড়িটা উঠলো কেঁপে, যেন ছাদের ওপর বাজ পড়েছে। একটা মস্ত লালহাতিয়া থপথপ করে করে এসে দাঁড়ালো পুষুর বিছানার পাশে। 'হো হো'। চেঁচিয়ে উঠলো লালহাতিয়াটা।

'লালহাতিয়া -পালা-লালহাতিয়া-পালা-লালহা-'কোনরকমে বলতে পারলো পুষু।

লালহাতিয়াটা একটু ঘাবড়ে গেলো।'মানে?' শুধোলো সে।

'এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও।' কড়া গলায় বললো পুষু।

লালহাতিয়াটা কেমন যেন হয়ে গেলো। ওর শুঁড়ের আগায় ঠোঁটদুটো তিরতির করে কাঁপতে লাগলো। ওর চোখদুটো ভরে এলো জলে।

'কি হলো?' পুষু জিজ্ঞেস করলো অবাক হয়ে।

'আমার খুব খিদে পেয়েছে, একটু জলখাবার খুঁজতে এসেছিলাম। আর তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো?' ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেললো লালহাতিয়া।

পুষুর মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। ঈশ, বেচারার খিদে পেয়েছে, আর সে কি না এমন চটেমটে কথা বললো ওর সঙ্গে?

'আমারও না কেমন খিদে খিদে পাচ্ছে', পুষু বললো,' একটু মধু খাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

পুষু ওর ছোট্ট চেয়ারে বসতে দিলো লালহাতিয়াকে। অতবড় লালহাতিয়াটাকে ওইটুকু চেয়ারে কি মজার দেখাচ্ছিলো।কিন্তু সে ব্যাটার অ্যায়সা খিদে পেয়েছিল যে ও এসব খেয়ালই করেনি।

মধুর বয়াম চেটেপুটে শেষ করতে করতে এবার পুষু আর লালহাতিয়া দুজনে মিলে একটা চমতকার সুন্দর স্বপ্ন দেখলো।

পার্থ দাশগুপ্ত
গড়িয়া, কলকাতা

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ২

-২-

তাই বলে আবার ভেবে বোসনা যেন যে রোজ রোজই ফেনা ভাত খেতাম। তোমরা কি রোজ একরকম খাবার খাও নাকি? একঘেয়েমি কাটাতে মাকে হিমশিম খেতে হয়না? আমার জন্য ও নানারকম ব্যবস্থা থাকত। সে সব বলতে বসলে সব শুনতে ভাল লাগবে না তো বটেই, এমনকি আমাকে "পেটুক বুড়ো" ভেবে বসবে। তবে একেবারেই কিছু না বললে কেমন করে হয়! যেমন ধর, শীতের সকালে রোদে পিঠ দিয়ে বসে বাসি পিঠে-পায়েস খাওয়ার মজাই আলাদা। তোমাদের নিশ্চয়-ই এরকম অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়া মোয়া মুড়কি, চিঁড়ে-পাটালি ও থাকত পালটে পালটে।

আমাদের বাড়ির কাজের ছেলে ছিল হরিশ। ওর দাদার নাম ছিল জিকা। ও খেজুর গাছ থেকে রস বার করত। মাঝে মাঝে সকালে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিত-"কি বেণুবাবু, একটু রস হবে নাকি? গেলাস নিয়ে এস..." শীতের ভোরে হি হি কাঁপতে কাঁপতে দুই গ্লাস রস ঢক ঢক করে গিলে ফেলতাম। এই অনুভূতিটা বলে বা লিখে বোঝানো যায়না। পারলে একবার গ্রামে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা করে এস। ভুলতে পারবে না কখনো।

যাকগে, যে কথা বলছিলাম... সকালের খাওয়ার পাট চুকলে যতক্ষন না পাঠশালা যাবার সময় হচ্ছে ততক্ষন যা খুসি কর।

এই সময়ে দাদু মাঝে মাঝে হারমনিয়াম নিয়ে গান গাইতে বসতেন। তিনি ভাল গান করতেন। এক এক দিন আমাকে ডেকে নিতেন। দাদুর সঙ্গে গলা মেলাতাম ঠিকই তবে কতটা হত বলা মুশকিল। এরকম একটা গানের কথা মনে আছে -"আজি এসেছি বন্ধু হে..."

পাঠশালা যাওয়ার সময় দিয়ানি স্নান করিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বইপত্র গুছিয়ে দিতেন। বই পত্রের কথা

বললাম যেন কতই বই ছিল তোমাদের মত!। মাত্র তো দুখানা বই! একটা বর্ণপরিচয় আর একটা ধারাপাত। এছাড়া ছিল সেই ভারি স্লেট খানা আর পেন্সিল।

আমার শিক্ষার শুরু হয়েছিল যাঁদের হাতে তাঁদের প্রথম জনের নাম তো আগেই বলেছি। তিনি আমার দাদু। এর পর যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন পাঠশালার "হেড স্যার", যিনি "বড় মাস্টার" নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। মোট তিনজন শিক্ষকের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। নাম ছিল রামসুন্দর বাবু। গ্রামের লোকেরা পাঠশালাকে বলত রামসুন্দরের পাঠশালা।

অতি সাধারন পোষাক ছিল তাঁর। হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়েও একটা কিছু থাকত। দেখতে কালো, রোগা, ঢ্যাঙামত এবং মাথায় কদমছাঁট পাকা চুল। আর বয়স? পঞ্চাশ থেকে সত্তর - যে কোন একটা।

যেকোন কারনেই হোক, তিনি মাঝে মাঝেই কামাই করতেন। যেদিন আসতেন বেশির ভাগ দিনই মেজাজ থাকত তিরিক্ষি। হাতে একটা লিকলিকে বেত নাচাতে নাচাতে পড়াতেন। কি যে ভয় করত, বাপরে! জানা জিনিস ভুল হয়ে যেত। অবশ্য আমি কোনদিন শাস্তি পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। সোমবারটা হত ভয়ঙ্কর। বেঞ্চিতে সপাং করে বেতটা মেরে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করতেন "আজ কি বার?"-অর্থাৎ গতকাল রবিবার ছিল, তাই সোমবার পড়া চাই-ই চাই!!

তোমরা "পথের পাঁচালি" বইটা পড়েছ, বা সিনেমাটা দেখেছ? অপুর পাঠশালার কথা মনে পড়ে? সেই যে গুরুমশাই যিনি মুদিখানা চালাতেন, পাড়ার মাতব্বর দের সাথে আড্ডা দিতেন, আবার পড়াতেন ও!

আমাদের বড় মাস্টার ও কতকটা সেরকমই ছিলেন। তিনি দোকান চালাতেন না, তবে পাশা খেলার দারুন নেশা ছিল।খেলতেন আবার আমার দাদুর সাথে। সেই কারণেই বোধহয় আমি কখনো শাস্তি পেতাম না। আমাদের ধারাপাত মুখস্থ করতে দিয়ে তিনি চলে যেতেন পাশা খেলতে!

ধারাপাত মুখস্থ করার ব্যপারটা ছিল বেশ মজার। শ্রেণীর সবচেয়ে গাঁট্টাগোট্টা ছেলে ছিল আমার বন্ধু ছানু, তাকেই ডেকে নিতেন তিনি। ছানু জোরে চেঁচিয়ে বলত, "একে চন্দ্র-অ-অ-অ" বাকিরা একসাথে চিতকার করে সেটাই আবার বলত। এরকম করে এক থেকে একশো পর্যন্ত চলত। শুনবে নাকি কিছু কিছু? প্রথমে এক থেকে দশ এরকম -

একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ,
তিনে নেত্র, চারে বেদ,
পাঁচে পঞ্চবান, ছয়ে ঋতু,
সাতে সমুদ্র, আটে অষ্টবসু,
নয়ে নবগ্রহ, দশে দিক।

এর পরে "একের পিঠে এক এগারো, একের পিঠে দুই বারো..." এমন করে চলত, "নয়ের পিঠে নয় নিরানব্বই, একে শূণ্য দশ, দশে শূণ্য 'শ। অর্থাৎ এক থেকে একশো পর্যন্ত গোনা শেষ। এরকম বলতে হত বারবার। ক্লান্ত হয়ে পড়তাম একেবারে, গলা নেমে আসত আমাদের।

পাঠশালা ছিল আমাদের বাড়ির খুব কাছে। পাশা খেলার হারজিতের খবর সবটাই কানে আসত পরিষ্কার ভাবে। বেশ মজা পেতাম আমরা। বড় মাস্টার জিতলে চিতকার করে দাদুকে দুয়ো দিয়ে পাড়া মাথায় করতেন।

একটা করে দান শেষ হওয়ার পর খেয়াল হত ছাত্রদের পড়তে দিয়ে আসার কথা। তাই মাঝে মাঝে হাঁক পাড়তেন আমাদের উদ্দেশ্যে। আমাদের ক্লান্ত গলা আবার হয়ে উঠত চনমনে।

তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ভুলেই যেতেন যে আমাদের পড়তে দিয়ে এসেছেন। তাই অন্য সকলের সাথে আমাদেরও সেদিনের মত ছুটি হয়ে যেত।

(ক্রমশঃ)

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

পড়ে পাওয়া: পিঁপড়ের লড়াই

কীট-পতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়েদের জীবন কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এরা সামাজিক প্রানী এবং দলবদ্ধভাবে বাস করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেনীর বহু পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ দলেই সাধারণত স্ত্রী,পুরুষ ও কর্মী-এই তিন শ্রেনীর পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও জাতের কর্মীদের মধ্যে আবার ছোট কর্মী,বড় কর্মী ও যোদ্ধা এই তিন রকমের বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট পিঁপড়ে দেখা যায়। বাসগৃহ নির্মাণ,খাদ্য সংগ্রহ, সন্তানপালন এমন কি, যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ক্রীতদাসের মতো এই কর্মীদেরই করতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ের একমাত্র কাজ বসে বসে খাওয়া এবং বংশ বৃদ্ধি করা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় বহুবিধ পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো জাতের পিঁপড়ের দলে হাজার হাজার কর্মী থাকে। আবার কোনো কোনো জাতের পিঁপড়ের দলে কর্মীর সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটি মাত্র। অধিকাংশ পিঁপড়েই গর্তের মধ্যে অথবা বৃক্ষ কোটরে বাস করে থাকে। আবার কেউ কেউ বড় গাছের উপরে সবুজ পত্র-পল্লবের সাহায্যে বাস গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করে। উগ্র প্রকৃতি ও বিষাক্ত দংশনের জন্যে নালসো নামে এক জাতীয় লাল রঙের পিঁপড়ে আমাদের দেশে সর্বজন পরিচিত। হাজার হাজার নালসো এক বাসার মধ্যে একসঙ্গে বাস করে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাংলার কীট-পতঙ্গ

পড়ে পাওয়া বিভাগে আমরা আমাদের পছন্দের লেখক বা মনিষীদের লেখা থেকে বা তাঁদের জীবনের কিছু টুকরো তুলে ধরব। তোমার পছন্দের লেখক কে? তুমি কি তাঁর ছোটবেলা সম্বন্ধে কোন গল্প জানো? জানলে লিখে পাঠাও আমাদের। আমরা সবাই মিলে সেই লেখা পড়ব।

গত সংখ্যায় পেয়েছি: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি কি অপুকে চেনো? তার দিদি দুর্গাকে? তাদের গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরকে?

আমিও ছোটবেলায় চিনতাম না। একদিন দেখলাম আমাদের বাড়ির সবাই সন্ধ্যেবেলায় খুব সেজে গুজে কোথাও যাবার তোড়জোড় করছে।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছ মা?

মা বললো পাশের মাঠে।

কিহবে সেখানে?

'পথের পাঁচালী'সিনেমা দেখানো হবে।

আমিও সঙ্গ নিলাম সবার। দেখলাম অপুকে...দুর্গাকে...তাদের পিসি ইন্দিরঠাকরুনকে...মা সর্বজয়াকে ...বাবা হরিহরকে।

তার বেশ কিছুদিন পরে পড়েছিলাম 'আম আঁটির ভেপু'। পরিচয় হয়েছিলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যিনি এই অপু, দুর্গার সৃষ্টিকর্তা।

গতবারের ইচ্ছামতীর শীত সংখ্যায় পড়েছিলে বিভূতিভূষণের ডায়রীর কিছু অংশ। এবার একটু জেনে নিই তার সম্বন্ধে।

১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কাঁচড়াপাড়ার কাছে মুরাতিপুরে গ্রামে মামার বাড়িতে বিভূতিভূষণের জন্ম হয়। তাঁর নিজের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাকপুরে। বাবা মহানন্দ

বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃতের পন্ডিত। পান্ডিত্য এবং কথকথার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন। মা মৃণালিনী দেবী। বাবার কাছে পড়াশুনোর হাতে খড়ি। তারপর নিজের গ্রাম আর অন্য কয়েকটা গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনো করার পর ভর্তি হন বনগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়েন তখন তাঁর বাবা মারা যান। এরপর অনেক কষ্ট করে বিভূতিভূষণ পড়াশুনো করেছেন। থেমে থাকেননি। সেই গ্রামের ছেলেটা একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি টপকেছিলো। আশীর্বাদ পেয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের। আরো কত বিখ্যাত...আরো কত সাধারণ মানুষের। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়েছিলেন মনের ইচ্ছে থাকলে আর পরিশ্রম করতে পারলে একদিন স্বপ্ন সার্থক হয়।

'প্রবাসী' সেই সময়কার বিখ্যাত এক সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'। সেতো ১৯২১ সালের কথা। এর আটবছর পর প্রকাশিত হবে 'পথের পাঁচালী'। আর বিভূতিভূষণ জয় করে নেবেন অসংখ্য মানুষের মন। এরপর একের পর এক লিখবেন 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ইত্যাদি উপন্যাস। ছোটদের জন্য লিখবেন 'চাঁদের পাহাড়', 'আইভানহো', 'হীরা মাণিক জ্বলে' আরো অনেক কিছু। তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে আসে আমাদের গ্রামের কথা... ভালোলাগা নদীটির কথা... দেশের কথা... আর এক অন্তহীন পথ চলার কথা...।

বিভূতিভূষণ আমাদের ছেড়ে চলে যান ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর।

এর ঠিক পাঁচ বছর পরেই তরুণ গ্রাফিক আর্টিস্ট সত্যজিত রায় তাঁর প্রথম ছবির জন্য 'পথের পাঁচালী'কে বাছেন। তারপরের গল্প এক অন্য ইতিহাস।

কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

তথ্য সংকলন–
মৌমিতা সরকার
বালি, হাওড়া

মনের মানুষ: গন্ডালু গল্পকার

কালু, মালু, বুলু আর টুলু - চার বন্ধু পড়াশোনা করে কাঞ্চনপুরের এক স্কুলে, থাকে হস্টেলে। তারা চারজন প্রানের বন্ধু। পড়াশোনা আর খেলাধুলার ফাঁকে তারা ভালবাসে নানা জায়গায় বেড়াতে। আর ভালবাসে নানারকমের রহস্যের সমাধান করতে। বুদ্ধিমতী আর সাহসী এই চার বন্ধু ধরে ফেলে কত ছেলেধরা, ডাকাত, চোরাকারবারি আর আরো দুষ্ট লোকেদের। তাদের তাকলাগানো গোয়েন্দাগিরি দেখে বন্ধুরা তাদের নাম দিয়েছে 'গোয়েন্দা গন্ডালু' - মানে এক গন্ডা '-লু'।

এই চার বন্ধুর নানা রকম রহস্য সমাধানের গল্প ছাড়াও ছোটদের জন্য আরো নানারকমের গল্প আর প্রবন্ধ লিখেছেন যিনি, তাঁর নাম নলিনী দাশ।তাঁর নিজের জীবনের গল্প ও কিন্তু কম সুন্দর নয়!

নলিনী জন্মেছিলেন ১৯১৬ সালে এক অনন্য পরিবারে। তাঁর দাদু ছিলেন বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্যের জনক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি। বড়মামা ছিলেন হাসির রাজা সুকুমার রায়। আর মা ছিলেন পুন্যলতা চক্রবর্তী, যিনি তাঁর বাবা,দাদা আর দিদির মত 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প লিখতেন। নলিনীর বড়মাসি, পুন্যলতার দিদি ছিলেন আমাদের আরেক প্রিয় শিশু সাহিত্যিক, সুখলতা রাও।

নলিনীর বাবা অরুননাথ চক্রবর্তী বিহার সিভিল সার্ভিসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি পরিবারকে নিয়ে হাজারিবাগ, আরা, ছাপড়া - এইরকম সব নানা ছোট-বড় শহরে থেকেছেন। নলিনীরা ছিলেন দুই বোন -কল্যানী আর নলিনী। ওদের ছোটবেলাতেই ওদের সাথে থাকতে আসে অনাথ তিনটি খুড়তুতো ভাই-বোন - কল্যান, লতু আর ডলি। এই চার বোন আর এক ভাই মিলে হই-হুল্লোড় করে কেটে যেত ছোটবেলার দিনগুলো। ছুটিছাটায় ওদের সঙ্গে যোগ দিত ছোট্ট মামাত ভাই মানিক - সেই মানিক যিনি পরে আমাদের কাছে পরিচিত হন সত্যজিত রায় নামে।

এসব হল আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগেকার কথা। সেইসময় বিহারের সেইসব ছোট শহরগুলিতে মেয়েদের ভালো স্কুল ছিল না। নলিনীর মা পুণ্যলতা বিভিন্ন বই যোগাড় করে নিজে লিখে পাঠ্য বিষয় তৈরি করে চার বোনকে লেখাপড়া করাতেন। এইভাবে এই চার বোনের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল।

১৯৩০-৩১ সালে নলিনী বাকি দুই বোনের সাথে কলকাতায় এসে প্রথম স্কুলে ভর্তি হন- ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে -নবম শ্রেণীতে। তিনজনেই তখন একসঙ্গে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতেন। শৈশবে দেখা বিহারের সেই রুক্ষ সুন্দর প্রকৃতি আর পরে হোস্টেল জীবনের নানান অভিজ্ঞতা, পরবর্তীকালে গোয়েন্দা- গন্ডালু গল্প গুলি লেখার সময় তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

নলিনী কিন্তু পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলেজে ভর্তি হন

দর্শন(ফিলোসফি) নিয়ে পড়ার জন্য। তিনি এতই ভালো ছাত্রী ছিলেন যে তিনি বি এ পরীক্ষায় সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'ঈশান স্কলার' সম্মান লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে তিনি একটি পেপারে তাঁর অধ্যাপক ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের থেকে ৯৮% নম্বর পেয়েছিলেন।

এহেন একজন মানুষ তো তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষার জগতকেই বেছে নেবেন! তিনি তাই অধ্যাপিকা রূপে কলকাতার বিভিন্ন কলেজে পড়ান।

১৯৬২ সাল থেকে সত্যজিত রায় ও লীলা মজুমদারের সঙ্গে তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে যোগ দেন। মূলতঃ ওনারই উতসাহে ১৯৬৩ সালে 'সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড' তৈরি হয়, যাঁরা 'সন্দেশ' পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব নেন। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'সন্দেশ' ও অন্যান্য পত্রিকায় ছোটদের জন্য বহু ছোট -বড় গল্প আর প্রবন্ধ লেখেন। শুধুমাত্র 'সন্দেশ' পত্রিকাতেই তিনি ২৯ টি 'গোয়েন্দা গন্ডালু', ১৮টি অন্য গল্প আর ৭ টি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি হল 'সন্দেশ সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর', 'সন্দেশ সম্পাদক সুকুমার' আর 'সাতরাজ্যির মজা'।

তাঁর লেখাগুলির মধ্যে কিছু কিছুকে একত্রিত করে কয়েকটা বই প্রকাশ হয়। সেগুলি হল 'গোয়েন্দা গন্ডালু', 'গন্ডালু ও রানী রূপমতীর রহস্য', 'গন্ডালু ও হাতিঘিসার হানাবাড়ি' আর 'গন্ডালু আর অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য'।

অবশ্য একটা খুব ভালো খবর আছে। এই বছরই নলিনী দাশের গল্প সমগ্রের প্রথম খন্ড প্রকাশ হচ্ছে কলকাতা বইমেলায়। তাই যদি কালু, মালু, বুলু আর টুলুর সাথে একসঙ্গে বেড়িয়ে পড়তে চাও নানারকম রোমাঞ্চকর অভিযানে, তাহলে যোগাড় করে ফেল এই বইএর একটি কপি। দেখ, শুধু গোয়েন্দা গন্ডালুকেই নয়, তুমি ভালবেসে ফেলবে তাদের স্রষ্টাকেও।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ শ্রী অমিতানন্দ দাশ

মহাশ্বেতা রায়।
পাটুলি, কলকাতা

দেশে-বিদেশে

টোকিও না টাকি- কোথায় থাকি?

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬ থেকে ১৯ তারিখের মধ্যে চারদিনের জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাপান যাওয়ার সুযোগ ঘটে যায়। আমার যাত্রাপথ ছিল কলকাতা থেকে বিমানে ব্যাংকক হয়ে টোকিও। সেইমত ১৪ তারিখ ভারতীয় সময় রাত দুটোর সময় থাই এয়ার লাইন্সের বোয়িং বিমানে চেপে বসলাম। ঘড়ির হিসাবে ব্যাংকক যেতে ৪ ঘন্টা ১০ মিনিট আর সেখান থেকে টোকিও ৮ ঘন্টা ১০ মিনিট। আমরা সূর্যের গতির উল্টোদিকে যাচ্ছি বলে সময়টা বেশি লাগছে। ফেরার সময় ঘড়ির হিসাব মত এর থেকে অনেক কম সময় লাগবে।

দেখতে দেখতে ব্যাংকক এর সুবর্নভূমি বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। এই বিমানবন্দর এত বড় যে এর মধ্যে আমাদের কলকাতার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অন্তত গোটা বিশেক ঢুকে যাবে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত এত দূর যে অন্তত গোটা দশেক ফ্ল্যাট এস্কেলেটর আছে।

লম্বা ফ্ল্যাট এস্কেলেটর চলে গেছে কতদূর!

ব্যাংকক থেকে টোকিও পৌঁছে গেলাম সময়ের একটু আগেই। প্রথমেই যা চোখে পড়বে তা হল ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতা। অসম্ভব রকমের ভীড়, কিন্তু সব কাজকর্মই হচ্ছে সুশৃংখলভাবে। হোটেলে পৌঁছে স্নান সেরে বেরোলাম রাস্তায়। টোকিওর সব রাস্তা বাধঁনো। কোথাও মাটি দেখা যায় না। চেনা বলতে একমাত্র ম্যাকডোনাল্ড এর দোকান। সেখানেই রাতের খাওয়া সেরে এলাম।

টোকিওর ফুটপাথ -মাটি দেখা যায়না

১৬ তারিখ সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যেবেলা অন্যান্য দেশের বন্ধুদের সাথে কাছাকাছি বাজারগুলো ঘুরতে গেলাম। টোকিওর সব রাস্তাই এত ঝকঝকে যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

টোকিও শহর

রাতে হোটেলে ফেরার পর পাকিস্তানের বন্ধু সইদ আমাকে দিয়ে গেল ওর দেশ থেকে আনা প্যাকড চিকেন বিরিয়ানি। বাথরুমের গরম জলের কলে প্যাকেট গরম করে নিয়ে খেতে খেতে মনটা ভাল হয়ে গেল। কেমন যেন এক আত্মীয়তার অনুভব হল।

১৭ তারিখ সকালবেলা শিনাগাওয়া রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করলাম ফুকুই নামের এক ছোট

শহরের দিকে। চাপার সুযোগ হল সেই বহু শোনা বুলেট ট্রেনে। ভেবেছিলাম এমন জোরে যায় যে ট্রেনে বসেও তা বুঝতে পারব। কিন্তু ও হরি!!- ট্রেনগুলো এমন সুন্দর আর আধুনিক যে কোন ঝাঁকুনিই নেই। মনে হয় শিয়ালদহের লোকাল ট্রেনে যাচ্ছি। এই ট্রেনটার নাম হিকারি সুপার এক্সপ্রেস। এটা মাত্র পাঁচ ঘন্টায় ১০০০ মাইল যায়।সবচেয়ে বেশি স্পিড হচ্ছে ঘন্টায় ২৮৫ কিমি।

বুলেট ট্রেন

১৮ তারিখ সারাদিন কেটে গেল কাজেকর্মে। বিকেল বেলা ফেরার ট্রেন ধরলাম। আগের বারের মতই একদম ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ট্রেন ছাড়ল। এই ট্রেনেও আগের বারের মত মাত্র একজন সুসজ্জিত হকার তরুনী। কোল্ড কফি, জুস, কেক, এইসব পন্য তার। ট্রেনের কাঁচ তুলে হাওয়া খাওয়ার কোন গল্প নেই, চা গরম বলে কোন হকার নেই, নেই ঝালমুড়ি বা বাদামওয়ালা।

ট্রেনের ভেতর- চা, ঝালমুড়ি, বাদামভাজা...কিছুই নেই!

শিনাগাওয়া স্টেশনে নেমে এক পাশে গিয়ে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতবড় স্টেশন, এত

লোক ছুটছে, অথচ কোন হুড়োহুড়ি নেই।

স্টেশনে খুব ভিড়, কিন্তু হুড়োহুড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি নেই

কাজকর্ম শেষ হয়ে গেল। ২১ তারিখ ফিরে এলাম কলকাতায়। ঠিক নয়দিন বাদে গেলাম টাকি, নিছক বেড়ানোর জন্য। এবার সঙ্গে আমার স্ত্রী। ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে হাসনাবাদ লোকাল ধরে দুই ঘন্টা পরে টাকি। টাকি হাসনাবাদের ঠিক আগের স্টেশন। মাঝে যে সব স্টেশনগুলো পড়ল, তাদের নামগুলো অদ্ভূত - ভ্যাবলা হল্ট, লেবুতলা হল্ট, কড়েয়া কদম্বগাছি, ভাসিলা, মালতিপুর - নামগুলোর মধ্যেই কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা!! ট্রেনে যেতে যেতে নানারকম টুকটাক খাওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ খাবার হল 'মাথা সন্দেশ'।

টাকির পাশে ইছামতী নদী। ইছামতীর পাশের রাস্তাটি সরু, কিন্তু পিচের রাস্তা, এবং পরিষ্কার ও বটে! এই রাস্তাটির কোন নাম আছে কিনা কেউ বলতে পারল না।

টাকিতে নদীর ধার বরাবর রাস্তা

নদীর ধার বরাবর বেশ কটি খাবারের দোকান আছে। বাঁশের বেঞ্চে বসে নদীর দিকে মুখ করে বসলে

মনে হবে সারা পৃথিবীটা আমার। হটাত করে মনে পড়ে গেল টোকিওর কথা। এই মুক্ত চেহারাটা ওখানে ছিল না।

ইছামতী নদী

দুপুরবেলা ভ্যান রিকশা চেপে বেড়াতে গেলাম। প্রথমেই গেলাম বাংলাদেশ সীমান্তের সব থেকে কাছে যে জায়গাটা, সেই গোলপাতার জঙ্গলে। আরো দেখলাম রামকৃষ্ণ মিশন আর স্থানীয় বাজারহাট।

পরদিন দুপুরে বেড়তে গেলাম হাসনাবাদ। উল্টোদিকে পার-হাসনাবাদ যাবার জন্য দুই-তিন মিনিট অন্তর লঞ্চ ছাড়ছে। ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ পয়সা!! একটু ভালোভাবে যেতে গেলে এক টাকা বেশি দিতে হবে। বিজয়া দশমীর দিন টাকির যে বিখ্যাত ভাসান হয় তার মূল অনুষ্ঠান হয় এখানেই।

হাসনাবাদ - উল্টোদিকে পার হাসনাবাদ

এর পরদিন আমরা নৌকা চেপে বেড়াতে গেলাম ইছামতীর বুকে। ওই দেখা যায় বাংলাদেশ!!

কিন্তু বেশি কাছে যাওয়া বারন। তাই নদীর মাঝ বরাবরই থাকতে হল। দেখতে গেলাম মাছরাঙা

দ্বীপ। এই দ্বীপে বিভিন্ন বিরল প্রজাতির ভেড়া চাষ করা হয়।

দূরে ওই দেখা যায় বাংলাদেশ

দুপুরবেলা আমাদের ফেরার পালা। ভ্যান চেপে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ভাবলাম এই যে এভাবে ভ্যান এ চেপে যাওয়া, খোলা মাঠ, নদীর সঙ্গ, এরকম কি টোকিওতে পাওয়া যায়!! হয়ত জাপানেও এরকম জায়গা আছে, কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে সেই জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়না। এমনও হতে পারে, এইরকম আড়ম্বরহীন ভাবে হয়ত খুব উন্নত দেশগুলোতে ঘোরা যায়না। আহা, এমনটা যদি হত যে আমার শহরটার পরিকাঠামো আর ব্যবস্থা টোকিওর মত ঝকঝকে সুন্দর হত, আবার টাকির মত প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া যেত, তবে কেমন হত?

লেখা ও ছবি
অঞ্জন দাস মজুমদার
বালি, হাওড়া

টিয়াপাখিদের দেশে

ভাবো তুমি দাঁড়িয়ে আছ আর তোমার পাশে হঠাত একটা টিয়াপাখি উড়ে এসে বসল। তুমি ভাবছ সেটা আর এমন কি কথা? কথাটা হল - পাখিটা তিন ফুটের বেশি লম্বা!!-মানে হতে পারে তোমারই সমান লম্বা!!গায়ে উজ্জ্বল লাল-হলুদ আরে নীল রঙের পালক। আমার পাশে যখন এত বড় একটা পাখি উড়ে এল, আমি তো চমকে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার যোগাড়! তারপর অবাক হয়ে পাখিটার রঙের বাহার দেখতে থাকলাম। এই পাখিটার নাম স্কারলেট ম্যাকাও। এরা মধ্য ও দক্ষিন আমেরিকার বাসিন্দা।

স্কারলেট ম্যাকাও -উজ্জ্বল লাল, আকাশী নীল রঙের পালক

ভাবতে অবাক লাগে এদের গায়ের এত রঙের বাহার এল কোথা থেকে! পাখিগুলো রীতিমত পাখিদের স্কুলে পড়া -শিক্ষিত, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত। স্কুলে পাখিগুলোকে শেখান হয়েছে কি ভাবে মানুষের সাথে মেলা মেশা করতে হয়। এরা মজার খেলাও দেখাতে পারে। পাখিদের মধ্যে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা হলে স্কারলেট ম্যাকাও সেরা পছন্দের মধ্যে একজন হবেই হবে।

স্কারলেট ম্যাকাও খাবার নিচ্ছে আমার বন্ধু প্রদীপের হাত থেকে

কি, কেমন আছ? আগের সংখ্যায় আমরা গেছিলাম যেখানে প্রাকৃতিক বিস্ময় আছে। আজ এসেছি যেখানে শুধু অনেক ধরনের টিয়া পাখি আছে!জায়গাটার নাম প্যারট জাঙ্গল - স্থান- মিয়ামি, ফ্লোরিডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই জায়গাটা হল চুটিয়ে মজা করার জায়গা। জায়গাটা ফ্লোরিডা তে একটা দ্বীপের মধ্যে। সেখানে এই পাখিরা খাঁচার মধ্যে নয়, খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়ায়। সেই ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু। অস্ট্রিয়ার ফ্রানজ শের এর স্বপ্ন ছিল এমন একটা জায়গা বানানোর, যেখানে পাখিরা খাঁচায় নয়, খোলা আকাশের নিচে থাকবে।ওনার পরিবারের লোকেরা এই ভাবনাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে পাখিরা সব উড়ে চলে যাবে। দমে না গিয়ে ফ্রানজ শের ২৫ টা পাখি নিয়ে শুরু করেন প্যারট জাঙ্গল। এখন এখানে ১১০০ ক্রান্তীয় পাখি আর ২০০০ ধরনের গাছপালা আছে। সত্যি, একজন মানুষ নিজের মনের জোরে এগিয়ে গেলে কত কি করতে পারে!

দ্বীপে ঢুকলেই চোখে পড়বে রং-বেরঙ্গের টিয়াপাখি। পাখিদের কলরবে কান ঝালাপালা হওয়ার যোগাড়। অধিকাংশ পাখি আবার কথা বলতে পারে। সামনেই একটা বড় স্কারলেট ম্যাকাও এর সিমেন্টের মূর্তি বসান আছে। জায়গাটা সবুজ গাছপালা, অর্কিড, আর জানা-অজানা পশু-পাখিতে ভর্তি। চিড়িয়াখানাই বলা যায়। কিন্তু এইখানে সব ধরনের পশু পাখি নেই যা চিড়িয়াখানায় থাকে।

স্কারলেট এর লাল রঙ থেকে চোখ ফেরালেই এবারে নীল সোনা রঙের টিয়াপাখি। নাম ব্লু-গোল্ড ম্যাকাও। এদের পিঠের রঙ শরতকালের আকাশের মত নীল, আর পেটের দিকের রঙ উজ্জ্বল সোনার

মত হলুদ।

ব্লু-গোল্ড ম্যাকাও-পিঠের রঙ নীল আর বুকের পালক হলুদ

সবচেয়ে অবাক করা কথা হল, লজ্জা পেলে বা রেগে গেলে, এই পাখিদের গালের রঙ বদলে যায়!! ভাবা যায়!!ঠিক যেন মানুষের মত। এরাও লম্বায় প্রায় আড়াই ফুট হয়। এরাও মধ্যে এবং দক্ষিন আমেরিকার বাসিন্দা। এরা সবসময় দল বেঁধে থাকতে ভালবাসে। একা থাকতে একদম পছন্দ করে না। এরা মানুষের গলা ভাল নকল করতে পারে। এদের কাছে গিয়ে কথা বললেই এরা সহজেই কথা বলে।

নারকেল কিনতে যাই চল এবার। দোকানের একপাশে একটা নীল রঙের বেশ বড়সড় টিয়াপাখি রাখা আছে। তুমি ভাবছ এখানে টিয়াপাখি কেন? তুমি বললে নারকেলটা ভেঙ্গে দিতে। দোকানদার নারকেলটা নিয়ে পাখিটার দিকে এগিয়ে গেল। তুমি অবাক হয়ে ভাবছ- হচ্ছেটা কি? তারপর অবাক হয়ে দেখলে টিয়াপাখিটা এক চঞ্চুর ধাক্কায় নারকেলটা ফাটিয়ে দিল!!

হায়াসিন্থ ম্যাকাও- এই পাখি চঞ্চুর একধাক্কায় নারকেল ফাটাতে পারে

আমি কিন্তু একদম সত্যি কথা বলছি। এই টিয়াপাখিটা উড়তে পারা টিয়াদের মধ্যে সবথেকে বড়। রাজকীয় চেহারা। গোটা শরীর নীল রঙের পালকে ঢাকা। ঠোঁটের কাছে এক চিলতে হলুদ। কুচকুচে কালো চঞ্চু। যারা টিয়াপাখি ভালবাসে, তাদের নয়নের মণি- হায়াসিন্থ ম্যাকাও। এরা সাড়ে তিন ফুট অবধি লম্বা হতে পারে। ডানা মেললে এরা চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা হতে পারে, অর্থাৎ প্রায় একজন বড় মানুষের সমান লম্বা!!

এবার আমরা গেলাম অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বড় কাকাতুয়া দেখতে। ব্ল্যাক পাম কাকাতুয়া। এদের চঞ্চু কাকাতুয়াদের মধ্যে সবথেকে লম্বা। মজার ব্যাপার হল, দেখলে মনে হবে যেন জিভ ভ্যাঙ্গাচ্ছে।আসলে, এদের ওপরের চঞ্চু আর নিচের চঞ্চুর গঠন আলাদা বলে মুখ পুরোপুরি বন্ধ হয়না, তাই লাল জিভটা সবসময় দেখা যায়। তাই মনে হয় জিভ ভ্যাঙ্গাচ্ছে। এদের ও রাগ বা উত্তেজনা হলে গালের রঙ বদলে যায়।

ব্ল্যাক পাম কাকাতুয়া

প্যারট জাঙ্গল এর পাখিরা খেলা দেখাতে ওস্তাদ। টিয়াপাখি সাইকেল চেপে ব্যালান্স এর খেলা দেখায়। এমু, ময়ূর, বাজপাখি ও খেলা দেখায়।

টিয়াপাখি সাইকেলে চেপে খেলা দেখাচ্ছে

বাচ্চাদের খেলার জায়গায় অনেক গৃহপালিত পশু-পাখি আছে। আমার অবাক লেগেছে চাইনিজ সিল্কি চিকেন দেখে।

চাইনিজ সিল্কি চিকেন

এছাড়াও আছে পেঙ্গুইন, ক্যাসোওয়ারিস আর টার্কি। টার্কির ছবি পাঠালাম তোমার জন্য। আমি আগে কোনদিন টার্কি দেখিনি। তুমি কি দেখেছ? টার্কির গলার কাছে কি ঝুলছে বলত?

টার্কি -গলায় কি ঝুলছে বলত?

এছাড়া আছে ফ্লোরিডার বিখ্যাত কুড়ি ফুট লম্বা কুমির- নাম ক্রকোসরাস। ক্রকোসরাসের চোয়ালটাই চার ফুট এর বেশি লম্বা।

বিশাল লম্বা ক্রকোসরাস

আরো দেখলাম জলের ধারে ঘুলে বেড়াচ্ছে গোলাপি ফ্লেমিংগো। ফ্লেমিংগোদের ছবি দিয়ে আজকের লেখা শেষ করব। এদের গায়ের সব পালক গোলাপি। এরা শুধু চিংড়ি মাছ খায়। সবসময় দল বেঁধে থাকা

এই পাখিদের সবথেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায় কেনিয়াতে।

গোলাপি ফ্লেমিংগো

এবার ছবিগুলো কিন্তু আমার তোলা নয়। আমার কম্প্যুটর কিছুদিন আগে খারাপ হয়ে গিয়ে সব ছবি নষ্ট হয়ে যায়। আমার বন্ধু দেবযানী দাশগুপ্ত তাঁর তোলা ছবিগুলি আমাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

কেমন লাগল বল তোমার? আমি এবার তৈরি হচ্ছি মনার্ক প্রজাপতিদের পরিযান দেখব বলে। আমার বাড়ির খুব কাছ দিয়েই এপ্রিল মাস নাগাদ মনার্ক প্রজাপতিরা উড়ে যায়। তাদের যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে এবার ছবি তোলার ইচ্ছা আছে। জানাব তোমায়, ছবি তুলতে পারলাম কিনা।

দেবাশীষ পাল
ওকলাহোমা সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবিঃ
দেবযানী দাশগুপ্ত

ব্ল্যাক পাম কাকাতুয়ার ছবিঃ ফ্লিকার

ছবির খবর: ছোটদের তপন সিংহ

তোমরা কি তপন সিংহের নাম শুনেছ? তিনি ছিলেন ভারতের একজন প্রথম সারির চলচ্চিত্র পরিচালক। সিনেমার জগতে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল শব্দযন্ত্রী রূপে। তাঁর অনেক ছবি দেশে বিদেশে নানা সম্মান লাভ করেছে। বাংলা, হিন্দীএবং ওড়িয়া ভাষায় প্রায় চল্লিশটির মত ছবি বানিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে অনেকগুলি ছবি কিন্তু ছোটদের জন্য বানানো। গত ১৫ই জানুয়ারি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তপন সিংহ (০২/১০/১৯২৪ - ১৫/০১/২০০৯)।

শ্রী তপন সিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্প নিয়ে ১৯৫৭ সালে তপন সিংহ তৈরি করেন 'কাবুলিওয়ালা'। এই ছবিটি তোমরা দেখেছ কি? যেখানে ছোট্ট মেয়ে মিনির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল দূর আফগান দেশ থেকে সওদা করতে আসা রহমত কাবুলিওয়ালার। ছোট্ট মিনির 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' গানের সাথে নাচ দেখলে রহমতের মত তুমিও তাকে ভালবেসে ফেলবেই! রহমত কাবুলিওয়ালার সাথে বড় হয়ে যাওয়ার পরেও মিনির ভাব ছিল কি? ছবিটা বরং নিজে দেখে জেনে নিলে কেমন হয়?

১৯৬৫ সালে তৈরি হয় 'অতিথি'। সেটাও কিন্তু কবিগুরুর লেখা গল্প। এ সেই আপনভোলা ছেলে তারাপদর গল্প - যাকে মায়ের স্নেহ বা বন্ধুর ভালবাসা, কোন কিছুই বেশিদিন এক জায়গায় বেঁধে রাখতে পারেনা। তাই বাঁশীর সুরে, সব ভুলে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারাপদ।

১৯৭৪ সালে তপন সিংহ তৈরি করেন ছোটদের জন্য হিন্দি ছবি 'সফেদ হাতি'। এই ছবিটির গল্প তিনি নিজে লিখেছিলেন। সে এক আশ্চর্য সুন্দর ছবি!! গ্রামের ছোট্ট ছেলে শিবুর সাথে বন্ধুত্ব হয় জঙ্গলের হাতিদের রাজা, ধপধপে সাদা হাতি ঐরাবতের।ঐরাবত শিবুকে সোনার মোহরের সন্ধান দেয়। শিবুর কুটিল কাকিমা সব কিছু জানতে পেরে যায়। তারপর একদিন এক মহারাজা জঙ্গলে শিকার করতে এলে, লোভী কাকা কাকিমা তাকে গিয়ে সাদা হাতির কথা বলে দেয়। মহারাজা তখন শিবুকে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। তাই দেখে, বন্ধু ঐরাবত নিজের থেকে রাজার হাতে ধরা দেয়। এত অবধি পড়ে কি মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল? - আগে শেষটুকু তো শোন! ঐরাবতকে ধরা দিতে দেখে, শিবুর বন্ধু ময়না পাখি জঙ্গলের অন্য সব পশুপাখিদের ডেকে আনে। জঙ্গলের যত হাতি, বাঘ, সাপ আর পাখিরা মিলে, রাজা আর তার সঙ্গীদের ভয় দেখিয়ে ঐরাবতকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ছোটদের জন্য তৈরি করা তাঁর অন্যান্য ছবিগুলি হল 'সবুজ দ্বীপের রাজা' (১৯৭৯), 'আজ কা রবিনহুড' (১৯৮৭/হিন্দী), 'আজব গাঁয়ের আজব কথা'(১৯৯৯) আর 'অনোখা মোতি (২০০০/হিন্দী)। তবে তাঁর আরো বেশ কয়েকটি ছবি আছে যেগুলি বড়দের সঙ্গে ছোটরাও দেখে মজা পাবে। যেমন, 'এক যে ছিল দেশ' (১৯৭৭)। এই ছবিতে এক তরুন বৈজ্ঞানিক এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করেন যে তার এক ফোঁটা পেটে গেলেই সবাই সত্যি কথা বলতে শুরু করবে। তার ফলে হল কি? -যত কালোবাজারি আর মিথ্যাবাদী নেতারা সব সত্যি কথা বলে ফেলতে শুরু করল আর বেঁধে গেল নানা গন্ডগোল। ১৯৬৬ সালের 'গল্প হলেও সত্যি' এইরকম আরেকটা মজার ছবি। এক বড়সড় ঝগড়াটে পরিবারে, একদিন ভোরবেলা রাঁধুনি হয়ে এল এক অদ্ভুত মজার মানুষ। সে এমন এমন কান্ড ঘটাতে লাগল যে, সেই পরিবারের লোকজন সব ঝগড়া করতে ভুলে গেল!!

তপন সিংহের বেশিরভাগ ছবির মধ্যেই থাকত কোন না কোন সামাজিক ঘটনার দিকে আলোকপাত। তাঁর অনেক ছবির গল্পই কিন্তু জীবন থেকে নেওয়া সত্যি ঘটনার আদলে তৈরি। সেইসব ছবি তোমরা বড় হলে নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু আপাততঃ বাবা-মাকে বলে দেখত- যদি যোগাড় করতে পার 'সফেদ হাতি' বা 'সবুজ দ্বীপের রাজা'র একটা কপি! তাহলে দেখে ফেলতে পার এইসব দারুণ ছবি। সেইসঙ্গে একটু একটু করে চিনে নিতে পারবে সেই বিশেষ মানুষটিকে- যাঁর নাম তপন সিংহ।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: আলোর জাদুকর

-২-

ধীরে ধীরে সিনেমার জন্য মানুষের কৌতূহল আর নিছক জিজ্ঞাসায় থেমে থাকল না। কেউ কেউ ভাবলেন নতুন এই প্রকাশ মাধ্যমের সীমানা আরো বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখনো পর্যন্ত ছায়াছবি শুধু সাধাসিধা বাস্তব কে দেখাতে পারত, তাতেও খুব আলোছায়ার কারিকুরি ছিল না। তারা সরল ভাবে একটা ঘটনা একটাই যায়গা থেকে দেখত।

সিনেমাকে আরেকটু সম্ভাবনাময় করার জন্য এই সময় ফরাসী দেশের ইতিহাস আরেকজন মানুষকে পাঠিয়েছিল - তাঁর নাম জর্জ মেলিয়ে। তিনি পেশায় কিন্তু আসলে জাদুকর ছিলেন। মেলিয়ে ভেবেছিলেন যে তাঁর ম্যাজিক প্রদর্শনীতে এইসব চলমান ছবির মজাটাও জুড়ে নেবেন। শোনা যায়, তিনি লুমিয়ের ভাইদের কাছ থেকে একটা সিনেম্যাটোগ্রাফ যন্ত্র কিনতেও চেয়েছিলেন ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক দামে। সে যুগের পক্ষে খুব খারাপ দাম নয়। কিন্তু দুই লুমিয়ের ভাই রাজি হলেন না। তখন মেলিয়ে নিজেই নিজের যন্ত্র বানিয়ে নিলেন।

তখনো শতাব্দী শেষ হতে আর চার বছর বাকি। ১৮৯৬ সালের শরতকালে সেদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। প্যারিসের রাস্তায় মেলিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাসের ছবি তুলছেন, এমন সময় তাঁর যন্ত্রের শাটার আটকে গেল। ফলে কি হল বলতো? সমস্ত বাসের ছবিটাই কালো হয়ে গেল। ফিল্ম ডেভেলপ করার পর মনে হতে থাকল যে বাসটি হটাত করে হয়ে গেছে কালোকফিন বহনকারী গাড়ি!! মানুষ গুলি অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে আসছে!! অন্যরা হলে মুষড়ে পড়ত। মেলিয়ে কিন্তু এই ভুলটিকেই মনে করলেন আশীর্বাদ। কেননা তিনি বুঝতে পারলেন যে ক্যামেরা সত্যি কথা বলে এটা গেহাতই কথার কথা। তাকে দিয়ে ইচ্ছা করলেই বানানো কথাকেও সত্যি বলে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। এইভাবেই নিজের অজান্তেই মেলিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেন 'স্টপ মোশন টেকনিক'। বলা যেতে পারে, মেলিয়ে হলেন সেই মানুষ যাঁর হাত ধরে সিনেমার ইতিহাসে প্রথম, শুধুমাত্র "ঘটনা" পেরিয়ে, "গল্প" উঁকি দিল।

একটা গল্পকে কিভাবে সাজাতে হবে শটের পরে শট দিয়ে, সেটাও খানিকটা বার করতে পেরেছিলেন মেলিয়ে। আমাদের ভাষায় যেমন দাঁড়ি, কমা, ড্যাশ- এইসব থাকে, ঠিক তেমনি, ছবি জোড়ার সময় 'ফেড- ইন', 'ফেড-আউট', 'ডিসল্ভ'- এইসব কলা কৌশল মেলিয়ে খুঁজে বার করেন।

মেলিয়ের নানা ছবির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে "ভয়েজ টু দি মুন" (Le voyage dans la Lune)। ছবির মূল গল্প ছিল প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা জুল ভার্নের একটি উপন্যাস। সেই প্রথম ৮২৫ ফিট লম্বা একটা ছবি তৈরি হল যাতে আস্ত একটা গল্প ঠাঁই পেল।

'ভয়েজ টু দি মুন' এর একটি দৃশ্য

আজকে এই ছবিটা দেখলে হয়ত তোমাদের হাসি পাবে। ধরে নেওয়া হয়েছে চাঁদের পিঠ একটা সমতল জায়গা যেখান থেকে কেউ তলায় পড়ে যেতে পারে। আবার চাঁদে অভিযানের সময় যে ধরনের রকেটযানে চড়া এবং নামা দেখানো হয়েছে তাও খুব বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু মেলিয়ে কে আমরা অনেক উঁচু আসনে বসাই কারন যত নড়বড়েই হোক না কেন তাঁর ছবি, তিনিই তো আমাদের প্রথম ফিল্ম এর মাধ্যমে গল্প বলা শিখিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম সিনেমায় নানারকম "স্পেশ্যাল এফেক্টস" ব্যাবহার করেন। আর এই জন্যই যাঁর ছবি আমরা এত ভালবাসি সেই চার্লি চ্যাপলিন জর্জ মেলিয়েকে মনে করতেন "আলোর জাদুকর" (the alchemist of light).

(ক্রমশঃ)

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি সূত্রঃ উইকিপিডিয়া

পরশমণি: কেটলির গুঞ্জন

মা যখন রান্না ঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন সেখানে ঘুর ঘুর করতে ভালই লাগে। ঠিক কিনা বল?

এখন একবার রান্নাঘরে ঢুঁ মারলে কেমন হয়? দেখত মা কি করছেন? বোধ হয় কেটলি করে চায়ের জল চাপিয়েছেন গ্যাসের উপর। চল দেখি কেটলিটাকে নজর করি!

কিছু শুনতে পাচ্ছ? না, কিছুই শোনা যাচ্ছে না তো! আরে ও কি? ছুই-ই-ই করে একটা শব্দ হল না? হ্যাঁ, ওই তো আর একটা হল। শব্দটা একটু পরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খেয়াল করে দেখ, একটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আর একটা শুরু হচ্ছে। আর ক্রমশঃ শব্দের সংখ্যা বাড়তে থাকছে।

এরকম ভাবে অসংখ্য শব্দ একসাথে তৈরি হচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে একটা 'গুন গুন' আওয়াজ বের হচ্ছে কেটলি থেকে। এই আওয়াজটা ক্রমাগত বেড়ে বেশ জোরে শোঁ -শোঁ শব্দ তৈরি করল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই শব্দটা বেশিক্ষন না থেকেই অন্য রকম একটা 'ফর-র-র, ফর-র-র' আওয়াজ শুরু হল। এর তীব্রতা আগের থেকে অনেক কম।

এই আওয়াজটা শুনে মা বলবেন " জলটা ফুটে গেছে, চা ভেজাতে হবে..." - কি মনে হচ্ছে? জল ফোটার সঙ্গে আওয়াজের একটা সম্পর্ক আছে? ঠিক তাই। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। কেটলির মুখটা দেখ একবার। কি রকম গোল গোল করে সাদা ধোঁয়া বেরচ্ছে। ধোঁয়া বললাম বটে আসলে কিন্তু ওটা মোটেই ধোঁয়া নয়। ওটা কি তাহলে?

ওটা হল বাষ্প বা জলীয় বাষ্প। ঠিকমত ভাল করে দেখত সবটাই সাদা বাষ্প কিনা! না, কেটলির ঠিক মুখটার কাছে কোন সাদা ত দেখা যাচ্ছেই না, এমনকি কোন কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে না।

এসবের কারন জানতে ইচ্ছে করছে? তাহলে জেনেই নি ব্যপারটা, চল।

গ্যাসের আঁচে যখন জল গরম হচ্ছে তখন প্রথমেই গরম হচ্ছে কেটলির একেবারে তলাকার স্তরের জল। ফলে কেটলির তলায় তৈরি হচ্ছে জলীয় বাষ্পের ছোট ছোট বুদবুদ। ওগুলো বাতাসের বুদবুদ নয় কিন্তু! বুদবুদ গুলো তো জলের থেকে হাল্কা, তাই ওরা জল ঠেলে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এদিকে

ওপরের জল তো বুদবুদ গুলোর তুলনায় ঠাণ্ডা। তাই তারা ঠাণ্ডা জলের মধ্যে এসে চুপসে ছোট হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চুপসে একদম মিলিয়েই যায়! এই সময়েই "ছুঁইইই" করে শব্দ হয়।

জল যত বেশি গরম হবে তত বেশি বুদবুদ তৈরি হবে। আর তত বেশি করে শব্দ বেড়ে যাবে। এক সাথে অনেকগুলি শব্দ মিলে 'শন শন' আওয়াজ ছাড়ে।

সবটা জল যখন গরম হয়ে যায় তখন ঠাণ্ডা জল থাকেনা। বুদবুদ গুলিরও চুপসে যাওয়ার কোন কারন থাকেনা। সেগুলি সোজা ওপরে উঠে বড় হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ফটাস করে ফেটে যায়। ফটাস বললাম বটে তবে তত জোরে শব্দ হয় না। "ফড়" করে শব্দ হয় মাত্র। অনেকগুলো বুদবুদ অনবরত ফাটতে থাকার ফলে "ফড়ফড়" শব্দ তৈরি হয়। ব্যপারটা বোঝা গেল?

"ফড়ফড়" তো বোঝা গেল, কিন্তু সাদা ধোঁয়ার কি হল?

তোমরা বিজ্ঞান বই তে পড়ে থাকবে যে বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে। আমরা সেই বাষ্প কি দেখতে পাই? পাই না কারন বাষ্প দেখা যায় না। আমাদের কেটলিটাতে জল ফুটে বাষ্প তৈরি হয়ে নলের মুখ দিয়ে বাইরে আসছে। বাইরে এসেই ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় জলকণায় পরিণত হচ্ছে। সেটাই সাদা ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে।

নলের বাইরে যে ছোট্ট জায়গায় সাদা ধোঁয়া দেখা যায় না সেই জায়গার বাষ্প কেটলির খুব কাছে থাকায় ঠাণ্ডা হতে পারে না, আর তাই আমরাও দেখতে পাই না।

কেটলির গান শুনতে শুনতে বাষ্পের কথাও জানা হল। তাহলে বাষ্পের কথা আর একটু শুনতে বিশেষ আপত্তি হবে না বোধ হয়। শীতের সকালে খুব শীত পড়লে কথা বলার সময় মুখ দিয়ে ভকভক করে সাদা ধোঁয়া বার হয় সেটা লক্ষ করেছ তো? সেটার কারণ ও কেটলির বাষ্পের মত।

আমাদের শরীর টা গরম এবং নিঃশ্বাস বায়ু নাক মুখ দিয়ে বেরোবার সময় প্রচুর গরম জলীয়বাষ্প বার হয়। সেটা বাইরে এসেই ঠাণ্ডায় জমে জলবিন্দুতে পালটে যায়। তাই সাদা দেখায়।

দেখ, গল্পে গল্পে কেমন কতগুলো বিজ্ঞানের কথা জেনে ফেললে!!

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

জানা-অজানা: অমর একুশে

আমাদের পৃথিবী থেকে প্রতিদিন একটি বা দুটি করে ভাষা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। মানে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই ভাষায় কেউ কোনো দিন আর কথা বলবে না...কবিতা লিখবে না...গান গাইবে না। কি মনখারাপ হয়ে গেল বুঝি? আমারও মনটা ঠিক তোমারই মতন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো যখন শুনলাম ভাষার এই হারিয়ে যাওয়ার কথা। আমাদের দেশ ভারত থেকেও এরকম ভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে অনেক ভাষা। তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু সেটা তুলনায় অনেক কম। তুমি যখন অনেক বড় হবে তখন নিজের মাতৃভাষার সাথে এমন অনেক ভাষার খোঁজ রেখো যারা তোমার প্রতিবেশী কিম্বা তোমার দূরের দেশের বন্ধু। তাদের সাথে ভাব জমিও দেখবে কেমন মজা পাবে,আনন্দ হবে।

মাতৃভাষা যাতে হারিয়ে না যায়, মাতৃভাষা যেন তার যথার্থ সম্মান পায় তার জন্য বেশ কিছু তরুণ লড়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের জন্যই বাংলা ভাষা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা। সেই ভাষার কল্যাণেই আমরা ইচ্ছামতীর ভেলা ভাসাতে পেরেছি ইন্টারনেটে। সেই ভাষাটা ভালোবাসো বলেই তুমি এই মুহূর্তে অমর একুশে পড়ছো। আর সেই ভাষায় বেঁচে থাকি বলেই একুশে আমাদের প্রাণ... বসন্তের এক টুকরো সকাল...মাথা উঁচু করে বলতে পারার দিন এটাই পৃথিবীর আন্তর্জাতিকমাতৃভাষা দিবস। এই দিনে বিশ্বের সব মানুষ শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় স্মরণ করে মাতৃভাষাকে...নিজের দেশকে।

এতক্ষণে হয়তো জানতে ইচ্ছে করছে একুশে ফেব্রুয়ারী ঠিক কী ঘটেছিলো। ভাষা আন্দোলনটা কি? তবে শোন সেই সময়ের সেই বীর গাথা।

১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ ভারতের যেমন স্বাধীনতা দিবস তেমনই ভারতবর্ষের দ্বিখন্ডিত হবার দিন। একটা গোটা দেশ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। যে দুটো ভাই গায়ে গা লাগিয়ে ইস্কুলে যেত, মাঠে খেলতো,দুজনে একপাতে খেত,একই মায়ের কোলে ঘুমোতো তাদের জোর করে, ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। একই মাকে ভাগ করা হল ভারত আর পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তান রয়ে গেলেন হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। তাদের ওপর জোর করে উর্দু ভাষার ব্যবহার চাপিয়ে দেওয়া হল।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের আইন সভার প্রথম অধিবেশনে ইংরাজী ও উর্দুর সাথে বাংলাও হোক রাষ্ট্রভাষা এই প্রস্তাব রাখেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকায় এক বিশাল জন সভায় পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না ঘোষণা করেন পাকিস্তানে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আততায়ীর হাতে সেই সময়কার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মৃত্যু হবার পর খাজা নিজামুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী তিনি ঢাকার জনসমাবেশে জিন্নার কথাই পুনরাবৃত্তি করে বলেন,"উর্দু-একমাত্র উর্দুই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।" তাঁর এই উদ্ধত উক্তির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ভাষা সমিতি ৩০ জানুয়ারী সবাইকে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা প্রাঙ্গনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রের অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হবে। হরতালের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসকরা ছাত্রদের এই দাবী মানতে রাজী হন না। তাঁরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের চত্বরে সমস্ত মিছিল, জমায়েত নিষিদ্ধ করে দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেন। বিরোধী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতেরাও আসন্ন নির্বাচনের অজুহাতে ছাত্রদের এই ধর্মঘট তুলে নিতে বলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্ররা তাঁদের দাবীতে অবিচল থাকেন। ২১ ফেব্রুয়ারীর সকাল থেকেই ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের(বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ)চত্বরে জমায়েত হতে থাকেন। সেখানকার জমায়েত থেকেই তাঁরা প্রাদেশিক বিধান সভায় (বর্তমান জগন্নাথ হল) তাঁদের দাবী পেশ করতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল নিয়ে এগোতে থাকেন। মিছিলের গতিরোধ করতে পুলিশ প্রথমে শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। ছাত্ররা কিন্তু তাতে ভয় পায় না, পিছু হটে না। বরং আরও সাহস নিয়ে এগিয়ে যায় সামনে। এবার নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষনের নির্দেশ আসে। গুলি চলে মুহুমূহু। মারা যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত,মানিক গঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দীন আহমদ,গফরগাঁও গ্রামের তরুণ কৃষক আব্দুল জব্বার এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারী অবদুস সালাম। এছাড়া আরও দুজন শহিদ হয়েছিলেন, তাদের দেহ ছাত্ররা পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। অসংখ্য আহত ছাত্র সেদিন তাঁদের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে রক্ষার শপথ নিয়েছিলেন।

বর্বর এই পুলিশী হত্যাকান্ডের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে জমায়েত হন। ইস্কুল,কলেজ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। সরকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে কার্ফু জারী করেন। ২২ ফেব্রুয়ারী সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্রদের আয়োজিত গায়েবী জানাজা মিছিলে (আততায়ীদের হাতে যাঁরা খুন হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের দেহ পাওয়া যায় নি। তাই অদৃশ্য শব সজ্জিত সেই শবাধার নিয়ে যে মিছিল) অংশ নেন শতশত মানুষ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে ২৩ ফেব্রুয়ারী শহিদদের স্মৃতিতে ছাত্ররা রাতারাতি নির্মাণ করেন শহিদ মিনার। তিন দিন ধরে তাঁরা এই মিনার রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তারপর সরকারী পুলিশ বাহিনী এসে মিনার ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

শহিদ মিনার ভেঙে ফেললেও মানুষের মন থেকে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা মুছে ফেলা যায় নি। প্রতিদিনের ধূমায়িত এই বিক্ষোভে পরাজিত শাসক গোষ্ঠী ৯ মে ১৯৫৪ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো...যে বিদ্রোহ মানুষের মনে একটু একটু করে জমে উঠছিলো তার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭১ সালে স্বাধীন

বাংলাদেশের লড়াইয়ে। সে এক অন্য গল্প একটা ছোট্ট দেশের এগিয়ে চলার...মাথা উঁচু করার আখ্যান। সময় পেলে অন্য কোনো একদিন শোনাবো সেই গল্প।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) ২১ ফেব্রুয়ারী দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে স্বীকৃতি দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভাষা শহীদ মিনার

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হল বাংলা। ভারতবর্ষের ২৩টি স্বীকৃত ভাষার মধ্যে একটি হল বাংলা। বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার সরকারি ভাষা। এছাড়া আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং অসম রাজ্যের দক্ষিনের তিনটি জেলায় বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে। তাদের দেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে উপস্থিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীবাহিনী কে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে আফ্রিকার ছোট্ট দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে তাদের সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাভাষার জন্য আরেকটি বিদ্রোহ হয়েছিল ১৯৬১ সালে অসমের বরাক উপত্যকায়, যখন অসম সরকার একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা রূপে ঘোষনা করে। ১৯শে মে, ১৯৬১ সালে শিলচরে ১১ জন তরুন ভাষার জন্য মৃত্যু বরণ করেন। শেষ অবধি অসম সরকার বাধ্য হয় কাছাড়, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দি- এই তিন জেলায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃতি দিতে।

সামনেই খোলা আছে আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা 'একুশের গান'। ইচ্ছে করছে পড়তে...শুনবে কি তুমি?

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

আমি কোনোদিন বাংলাদেশ যাইনি। ইচ্ছে আছে,স্বপ্ন আছে একবার যাওয়ার। শহিদ মিনারের সামনে একবার মাথা নীচু করে দাঁড়ানোর। মনে মনে বলা...ভুলিনি তোমাদের, ভুলবো না কোনোদিন...তোমাকে মাতৃভাষা।

কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

সূত্র -

একুশে,প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,মাতৃভাষা দিবস উদযাপন সমিতি,বালি
বাঙ্গালনামা ব্লগ

ছবি সূত্র
উইকিপিডিয়া

কমিক্স কাহিনী: গাবলু আসলে হেনরি

তোমরা কি গাবলুকে চেনো? সেই ছোট্ট নেড়া মাথা ছেলেটাকে? যে দুহাত পকেটে পুরে শিষ দিতে দিতে নানারকম কান্ড বাধিয়ে ফেলতে পারে! ক্যান্ডি আর আইসক্রিম খেতে সে বড্ড ভালোবাসে। যারা এখন বেশ বড়, তারা ছোটবেলায় গাবলুর দেখা পেতে "আনন্দমেলা*"র পাতায়, মনে পড়ে কি? কিন্তু গাবলু তো আসলে হেনরি। বাংলা পত্রিকায় কি আর হেনরি নামটা ভাল লাগে? তাই হেনরি কে করে দেওয়া হল গাবলু। এই ধরনের নামের সাথেই বাঙ্গালিদের বেশি পরিচয়। শুধু নামটাই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র আর সবকিছুই একই আছে। তাই গাবলুর সম্বন্ধে জানতে চাইলে আসলে আমাদের হেনরি সম্বন্ধেই খোঁজ খবর করতে হবে।

কার্ল অ্যান্ডারসন নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক হটাতই এঁকে ফেলেন হেনরিকে। অ্যান্ডারসন আসলে অনেক দিন থেকেই কার্টুন আঁকার পেশায় যুক্ত। উনিশ শতকে যখন দৈনিক খবরের কাগজ নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে, সেই সময় থেকেই তিনি একজন কার্টুনিস্ট। ১৯২৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। নিউ ইয়র্ক শহরে অ্যান্ডারসনেরও রোজগার ভাল হচ্ছিল না। শেষমেষ ১৯৩২ সালে তিনি ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। তাঁর মনে পড়ল- আরে, আগে তো আমি ছুতোর ছিলাম!! কাঠের কাজ করতাম!! তাই সেই ৬৪ বছর বয়সে তিনি ঠিক করলেন কাঠের ক্যাবিনেট বানিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। তাহলে হেনরি কোথা থেকে এল?

আসলে কার্টুন ছিল অ্যান্ডারসনের ভালোলাগা আর ভালবাসা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি সান্ধ্য কার্টুন স্কুলে পড়াতে শুরু করলেন। একদিন পড়াতে পড়াতে তিনি এঁকে ফেললেন এক নেড়া মাথা ভুঁড়িওয়ালা ছেলের ছবি। তাঁর ছাত্রদেরও পছন্দ হয়ে যায় ছেলেটিকে। সাহস করে অ্যান্ডারসন আঁকাগুলি পাঠিয়ে দেন 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট 'নামে একটি পত্রিকার দপ্তরে। তাদেরও অ্যান্ডারসনের আঁকা ছোট্ট ছেলেটিকে খুব পছন্দ হয়। ব্যাস, ১৯৩২ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে যায় 'হেনরি' নামে একটি নতুন কমিক স্ট্রিপ। অ্যান্ডারসন ঠিক করে নিয়েছিলান যে তাঁর কমিক স্ট্রিপের চরিত্ররা খুব বেশি কথা বলবে না, গল্প বলা হবে অল্প শব্দ, কিছু চিহ্ন এবং প্রধানতঃ ছবির মাধ্যমে। এই ধরনের

কমিকস কে বলা হয় প্যান্টোমাইম কমিকস (Pantomime comics)। ভাষা জানা না থাকলেও এই ধরনের কমিকস অনায়াসেই বুঝে ফেলা যায়।

দেশে বিদেশে হেনরি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সবথেকে বড় কমিকস প্রকাশনা সংস্থা 'কিং ফিচারস সিন্ডিকেট' এর মালিকের নজরে পরে এই কমিক স্ট্রিপ। তাঁরও হেনরি কে পছন্দ হয়ে যায় আর ছোট্ট হেনরি 'কিং ফিচারস' এর সদস্য হয়ে যায়। সেখানে অ্যান্ডারসন তাঁর দুজন সহকারী ডন ট্র্যাকটে আর জন লিনে কে নিয়ে কাজ শুরু করেন। এক সময়ে বয়সের ভারে অ্যান্ডারসনকে আঁকাআঁকি ছেড়ে দিতে হয়। তাঁর সহকারীরা এগিয়ে নিয়ে যান হেনরির কার্যকলাপ। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন চরিত্র একেছেন। আরো পরে যাঁরা এই কমিক স্ট্রিপের দায়িত্ব পান, তাঁরা হেনরিকে দিয়ে কথা বলাতেও শুরু করেন।

হেনরি আসলে এক জেদি নির্বিকার ছেলে। সে তার নিজের সমস্যা গুলোর সমাধান করে সব অভাবনীয় উপায়ে। মাঝে মাঝে আবার হেনরি খুব বোকা। একদিন হেনরি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেওয়ালে নিজেরই ছায়া দেখে অবাক হয়ে যায়। সে মনে করে কেউ তার পিছু নিয়েছে!! তড়িঘড়ি নিজের ছায়ার সাথে মারামারি শুরু করে সে, আর নিজের হাত ভেঙ্গে ফেলে!! আবার তার মাথায় আসে সব অদ্ভূত বুদ্ধি। হেনরি তার কাকার জন্মদিনে কেক বানাল...কিন্তু বাড়িতে একটাও মোমবাতি নেই। কি করবে সে? - আর কি? কেকের মধ্যে বসিয়ে দিল একটা বৈদ্যুতিক বাতি!!

তোমরাও কি হেনরির এইসব কান্ডকারখানার গল্প গুলো পড়েছ? তোমরা কি হেনরিকে অন্য কোন নামে চেন? আমাকে জানিও তো!

অ্যান্ডারসন ১৯৪২ সালে লিখেছিলেন 'How to Draw Cartoons Successfully'।এই বই আমাদের সবার জন্য রেখে গেছেন তিনি। হাতের কাছে বইটা পেলে পড়ে দেখ ...আর জানতে চেষ্টা কর হেনরির জনপ্রিয়তার রহস্যটা।

পূর্বাশা
নিউ আলিপুর, কলকাতা

*আনন্দমেলা হল বাংলা ছোটদের পত্রিকা। এটি এ বি পি প্রকাশনালয় কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

এক্কা-দোক্কা: হারিয়ে যাওয়া খেলা

কানামাছি ভোঁ ভোঁ, এলাটিং বেলাটিং, বুড়ি চোর - এমন সব শব্দ গুলো কি তোমার চেনা মনে হচ্ছে? হয়তো তোমার কাছে এগুলো সব নতুন শব্দ। আসলে এগুলো এক-একটা খেলার নাম। কি ফিক-ফিক করে হাসছো নাকি? তাহলে শোনো, আমাদের ছোটবেলায় এমনই সব খেলার মধ্যে দিয়ে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামতো। সন্ধ্যের শাঁখের আওয়াজের আগেই অনিচ্ছায় খেলা ছেড়ে...বন্ধুদের ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসতে হতো। আমাদের ছোটবেলার সেই খেলাগুলো কেমন ভাবে খেলা হত সে কথা বলি।

কানামাছি -- উবু দশ,কুড়ি-এমন ভাবে গুণে যতজন মিলে খেলা হত-একশো গুণে তারা সবাই উঠে গেলে শেষের যে জন পড়ে থাকতো তাকেই হতে হতো কানামাছি। তার চোখ বেঁধে, চোখের সামনে আঙুল নিয়ে গুনতে বলে, সে দেখতে পাচ্ছে কিনা...তার পরীক্ষা নিয়ে খেলা শুরু হত। "কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ" বলে অন্যেরা তার চারিদিকে ছোটাছুটি করতো। সেই শব্দ আন্দাজ করে চোখ বাঁধা অবস্থায় সে যাকে ছুঁতে পারতো, তাকেই আবার কানামাছি হতে হতো।

চোর চোর -- একই রকম ভাবে শুরু করে মানে ঠিক আগেরটার মতোই উবু দশ,কুড়ি করে সকলের শেষে যে পড়ে থাকতো সেই চোর। খেলা একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। দলের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট অথবা দৌড় ঝাঁপ করতে পারে না-সে হত বুড়ি। যে চোর হত তাকে অন্য খেলুড়েদের দৌড়ে ছুঁতে হতো। কিন্তু ছোঁওয়ার আগে সে যদি বুড়ি ছুঁয়ে দিতে পারতো-তবে সে "মোড়"হবে না। সে বেঁচে যাবে। অপেক্ষাকৃত বড়দের জন্য এই খেলাটির একটা রকমফের ছিলো-"ডপ্পা ডপ"। এই খেলাটারএলাকা অনেক বড় হতো। "ডপ্পা ডপ"শব্দে চোরকে জানান দেওয়া হত। চোর সেই শব্দ সন্ধান করে তাকে খুঁজে পেলে তাকেই আবার চোর দিতে হত।

এই দুটি খেলা ছেলে মেয়ে উভয়েই খলতে পারতো। কিন্তু এলাটিং বেলাটিং খেলাটি মেয়েদের মধ্যেই

খেলা হত। দুদলের মধ্যে এই খেলায় একদল প্রথমে-"এলাটিং বেলাটিং শৈল...কিসের খবর আইলো...রাজা একটি বালিকা চাইলো..." বলে যার নাম বলা হত তাকেই অন্য দলে সামিল হয়ে "নিয়ে যাও নিয়ে যাও বালিকা..." তাদের দলেরই কাজে লাগতো। এমন ভাবেই খেলা চলতো যতক্ষণ না কোনো একটি দলের একজন অবশিষ্ট থাকতো।

এক্কা-দোক্কা -- ছয় অথবা দশ ঘরের আয়তকার ক্ষেত্রের মধ্যে দাগ দিয়ে ঘর তৈরী করে এই খেলাটি বাড়ির সামনের মাঠে অথবা উঠোনে খেলা হতো। একপায়ে প্রতিটি ঘর ঘুরে ঘুরে "কিত কিত"শব্দে এসে উলটো মুখে খোলামকুচির ঘুঁটি ছুঁড়ে কোন একটি ঘর নিজস্ব ভাবে কেনা হতো। তাতে একপায়ে সব কটা ঘর পেরবার খাটুনি বাঁচতো। একদমে কিত কিত শব্দের উচ্চারণের ফাঁক পাওয়া যেত "তা" নামক এই বিশ্রামে, নিজস্ব ঘরে। যে ঘর একবার কেনা হয়ে যেত প্রতিপক্ষ সে ঘরের কোনো অধিকার পেত না। তাকে সেই ঘর ডিঙিয়ে পেরোতে হতো। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি খোলামকুচি যদি ঘরের দাগে পড়তো সে "মোড়"হত। অন্যেরা দান পেত।

বৌ-বসন্ত -- একদলের একজনকে বৌ বসিয়ে অপর দল তার চারপাশে ঘুরবে। অন্যদলের খেলুড়েদের একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুঁয়ে প্রতিপক্ষকে "মোড়" করতে হবে। অবশ্য বৌ ছুঁয়ে দিলে সে মোড় হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। সকলকে মোড় করে তার দলের বৌ ফেরত নিয়ে অপর দলের বৌকে বসানো যাবে। এমন সব অনেক খেলাই তখন গ্রামে শহরতলীতে ছোটরা খেলতো। গ্রামে এসব খেলার চল এখোনো কিছুটা থাকলেও শহরতলীতে এসব খেলা এখন আর কেউ খেলে না।

আশা করি আগামী সংখ্যায় আরো অনেক খেলা নিয়ে তাদের হরেক গল্প নিয়ে তোমার কাছে হাজির হতে পারবো। আজ এই পর্যন্ত থাক। ভালো থেকো।

প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
বালি, হাওড়া

আঁকিবুকি

অনুভব শেঠ, ৭ বছর, বেইজিং, চিন

মালিকা দত্ত, ৮ বছর, কলকাতা

সম্পূর্ণা ঘোষ, ৮ বছর, লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র